বগীগাড়ীর ডাক্তারবাবু

আর্থার ই হের্ট্স্‌লার, এম-ডি

নিউ গাইড
১২, কৃষ্ণরাম বোস স্ট্রীট : কলিকাতা-৪

মূল্য : দুই টাকা

Bengali translation of

THE HORSE AND BUGGY DOCTOR

(Condensation)

by

Arthur E. Hertzler, M.D.

Original title in English published by Paul B. Hoeber, Inc.

Copyright, 1938 by Paul B. Hoeber Inc. Abridged from the book in the Author's own words. Reproduced by the Permission of the Author and the Publisher.

শ্রীসুকুমার ঘটক কর্তৃক টেম্পল প্রেস, ২, ন্যায়রত্ন লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
এবং শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক নিউ গাইড, ১২, কৃষ্ণরাম বোস স্ট্রীট
কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা : দীপেন বসু

ভূমিকা

ভবিষ্যতে যাঁরা কলম ধরবার তাগিদ অনুভব করবেন তাঁদের কাছে আমার এই লেখাটি সাবধান বাণীর মত কাজ করবে। খুব সাধারণ ভাবেই এই লেখা আরম্ভ করেছিলাম। আমার মেয়ে সম্প্রতি নার্সিং শিক্ষা সমাপ্ত করেছে। সে আমার প্রথম জীবনের কাহিনী জানতে চেয়েছিল। তার একটি ছোট ছেলে আছে। সেই ছেলেটি যাতে রোগাক্রান্ত না হয়, সেজন্য সময় থাকতে রোগ নিবারক ওষুধের সাহায্যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাই তার উদ্দেশ্য।

আমার একটি প্রকাশক বন্ধুর কাছে হঠাৎই একথা ব'লে ফেলেছিলাম। আরও গুরুত্বপূর্ণ অপর একটি লেখা লিখতে কেন বিলম্ব হচ্ছিল, তারই কৈফিয়ৎ স্বরূপ আমি একথা বলেছিলাম। তিনি আমাকে নানারকম প্রলোভন দিয়ে দেখতে চাইলেন, আমি কি লিখেছি। যুক্তি দেখান হ'ল যে, কোন বৃদ্ধ গাঁয়ের ডাক্তারের জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁরই ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকা উচিত। যুক্তিটি স্বীকার ক'রে নেওয়া গেল।

লেখবার সময় আমার ব্যক্তিসত্তাকে ভুলে যেতে হ'ল। একজনের জীবতকালে তার নিজেরই জীবন-কাহিনী ব'লে যাওয়া সমীচিন নয়। কিন্তু এ কাহিনী ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। কারণ এই একই কাহিনী অসংখ্য গ্রাম্য ডাক্তার লিখতে পারতেন। অবশ্য সেগুলির প্রত্যেকটিতে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রভাবের ছাপ থাকত। কাজেই এ লেখাটি কোনক্রমেই আত্মজীবনী নয়। বরং আমার সময়কালেরই একটি প্রতিচ্ছবি। যতটুকু ব্যক্তিগত কাহিনী বললে এই লেখাটি সুসঙ্গত হয় ততটুকুই বলেছি। যে সকল ঘটনার বিবরণ এতে দেওয়া হয়েছে, তা ব্যক্তিগত নয়, বরং সামগ্রিক। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তাদের যথাযথ ব্যাখ্যা করা চলে। কোন চিকিৎসকের পক্ষে যা অনুভব করা সম্ভব তা হয়ত তাঁর চিন্তার বাইরে। চিন্তা ও অনুভূতির সামঞ্জস্যতেই তাঁর জীবনদর্শন গ'ড়ে উঠবে। প্রথমটি তিনি নিজেই ক্রমশঃ গ'ড়ে তোলেন. দ্বিতীয়টি অনেক পরিমাণেই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া।

—গ্রন্থকার

[library stamp]

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী
CALCUTTA

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রার্থনায় বাবা বেশ জোর গলায় বলে উঠলেন: "হে ভগবান, ডিপথিরিয়া রোগের কবল থেকে আমাদের রক্ষা কর"—রোগের পরিণাম যে কত ভয়ঙ্কর তা প্রথম বুঝতে পারি ওঁর ঐ কথাগুলি শুনে। সেদিন সকালে আমাদের বাড়ীর আবহাওয়া থমথমে ছিল। বাবা মা প্রাতরাশে কিছুই খাননি, আর আমরা শিশুর দল কেন জানি না ভাজা খাবারের বড় পাত্রটিতে প্রায় হাত না দিয়েই উঠে পড়লাম—অথচ অন্যান্য দিনে ঐ খাবারটি টেবিলের ওপর পড়তে পেত না। শীঘ্রই বাবা তাঁর রবিবারের পোষাক প'রে বেরিয়ে পড়লেন। মা পাণ্ডুর মুখে স্তব্ধ—নিজের হাত মোচড়াতে মোচড়াতে ক্রমাগত ঘরের মেঝের ওপর পায়চারি করতে লাগলেন এবং মধ্যে মধ্যে জানলার ধারে গিয়ে রাস্তায় যেন কী দেখতে লাগলেন। আমিও মার পিছনে পিছনে গিয়ে রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত দৃষ্টি মেলে ধরলাম—কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। ঘণ্টা কয়েক পরে কয়েকটি দলের একটি দীর্ঘ শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে ঐ রাস্তা দিয়ে আসতে লাগল। সব চাইতে আগের দলের বিচিত্র ধরণের গাড়ীখানি বাবা চালাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁর পাশে যে ভদ্রলোকটি বসেছিলেন তাঁকে আমি চিনতে পারলাম না। চাষ-আবাদের জন্য ব্যবহৃত ভারবাহী চারচাকার গাড়ীর খোলা জায়গাটির উপর তিনটি আয়ত বাক্স ছিল। ওদের পিছনে আসছিল স্প্রিংয়ের গাড়ী এবং গোলাবাড়ীর লম্বা লম্বা গাড়ীগুলি—তাছাড়া ঘোড়ার পিঠেও অনেক লোক আসছিল। মাকে প্রশ্ন ক'রে কোনই জবাব পাওয়া গেল না। বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে বাবা বাড়ী ফিরলেন এবং দরজা দিয়ে ঢোকবার সময় রহস্যজড়িত কণ্ঠে শুধু বললেন,

"আরও পাঁচটি"। মা একটি চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন এবং বহির্বাস দিয়ে তাঁর মুখ ঢাকা দিলেন।

অনেকদিন পরে আমি জানতে পারলাম যে ঐ চারচাকার গাড়ীটি আমার তিনটি খেলার সাথীর মৃতদেহের শবাধার বহন ক'রে এনেছিল। একটু পরেই আরোও পাঁচটি এল। দশদিনের মধ্যেই ঐ একটি পরিবারেই ন'টি শিশুর মধ্যে আটটি ডিপথিরিয়া রোগে মারা পড়ল।

অন্যান্য পরিবারেও ডিপথিরিয়া যে সর্ব্বনাশ ঘটালো তার ভয়াবহতা ওর চাইতে কিছু কম নয়। আমি অনেকগুলি গোরস্থানের কথা জানি, যেখানে দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই চার-পাঁচটি সমাধি গহ্বর খনন করা হয়েছিল। আমার চিকিৎসা-বৃত্তি অনুশীলনের প্রথম দিকে যে কোনও পরিবারের ইতিহাস পর্য্যালোচনায় সচরাচর দেখা যেত যে, সেই পরিবারের কিছু লোক কোন-না-কোন সংক্রামক শিশুরোগে মারা গিয়েছে। তার মধ্যে সব চাইতে বেশী মারা গিয়েছে ডিপথিরিয়া রোগে।

ডিপথিরিয়া রোগের মড়কের ভীতি-সঙ্কুল দিনে সমস্ত মানবজাতির মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। সেই বৈশিষ্ট্যটি এই যে, অজানা বিপদের সম্মুখীন হ'লে মানুষ সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের সাহায্য ভিক্ষা করে। সেই সমস্ত সর্ব্বনাশা দিনগুলিতে আত্মরক্ষার প্রার্থনায় যেন আকাশ-বাতাস ভ'রে উঠত। চিকিৎসা-বিজ্ঞান ব'লে কোনও বিজ্ঞানই তখনও গ'ড়ে ওঠেনি, তাই তার প্রতি কোনও আবেদনও ছিল না। সমস্ত প্রার্থনাই দুর্ব্বোধ্য করুণ অনুনয়ে পূর্ণ। চিকিৎসকেরা যেন রোগ সারাবার ওষুধ আবিষ্কার করতে পারেন, এমন প্রার্থনা কেউই করেনি। এই সম্ভাবনার কথা কারুরই মনে আসেনি।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান যে কতদূর এগিয়েছে তা উপলব্ধি ক'রতে হ'লে পঞ্চাশ বছর আগেকার একটি যথার্থ ডিপথিরিয়া রোগের গতিপথের চিত্র আঁকা যাক।

রোগাক্রান্ত শিশু স্থূলাকার ধারণ করে, নির্জীব হয়ে পড়ে এবং জ্বর-জ্বর ভাব বোধ করে। গলার ক্ষতের কষ্টের কথা রোগী কখনও জানায় কখনও বা জানায় না কেননা গলগ্রন্থির প্রদাহে (tonsilitis) যেমন ক্ষতের চারপাশে রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়, ডিপথিরিয়ায় ও রকম হয় না। সূক্ষ্ম ঝিল্লী গলগ্রন্থি ও কণ্ঠনালীর উর্দ্ধভাগের (pharynx) আশপাশের জায়গাগুলি—এমন কি নাসিকার নালী পর্য্যন্ত অল্প-বিস্তর আচ্ছাদন ক'রে রাখে। নাড়ীর গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত আর অনুভব করাই যায় না। কয়েকটি রোগীর ক্ষেত্রে ঝিল্লীটি নাসিকার নালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়: ঝিল্লীর বিস্তৃতি তখনই ধরা পড়ে যখন নাসিকানালীতে শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধার সূচনা হয়। এই ধরণের রোগীরা রোগ-জীবাণুর দ্বারা উৎপন্ন বিষের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ রক্তদুষ্টির ফলে মারা যায়।

এর চাইতেও বেশী চমকপ্রদ রোগের ব্যাপার হচ্ছে সেইগুলি যাতে রোগের সূত্রপাত হয়েছে কণ্ঠনালীতে বা রোগ উপর থেকে ঐ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। ঝিল্লীটি ক্রমে ক্রমে শ্বাসনালীর পথকে অবরুদ্ধ ক'রে ফেলে। জ্বরাক্রান্ত বিকারগ্রস্থ শিশুর শ্বাসনালীর পথ যতই অবরুদ্ধ হ'তে থাকে ততই তার দেহ ক্রমেই অধিকতর নীল হতে থাকে। তখন সে এত ঘন ঘন শ্বাস নিতে থাকে যে সে কাঁদতেও পারে না। গাঢ় নীল মুখমণ্ডলের আকৃতি বীভৎসতর করে তোলে তার কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা দৃষ্টিহীন চোখ দুটো। মাথা এবং কাঁধ দুটো এলিয়ে পড়ে এবং হাতের পেশীর আকস্মিক সঙ্কোচন সুরু হয়। তারপর সমস্ত শরীর শিথিল হ'য়ে পড়ে এবং মুখমণ্ডল হয় পাংশুবর্ণ। অবশেষে শিশুটি মারা যায়। আমি জীবনে মাত্র একবারই এই ধরণের ভয়ঙ্কর এক রোগীর পাশে অসহায় অবস্থায় ব'সে রাত কাটিয়েছি।

অতীত দিনে একমাত্র ডিপথিরিয়া রোগই যে বহু পরিবারকে ধ্বংসের

পথে নিয়ে যেত তা নয়। লালজ্বরের (Scarlet fever) মড়কও সমগ্র পল্লীর উপর দিয়ে বয়ে যেত এবং মূত্রাশয়ের জটিলতায় বা কর্ণাবিবর আক্রান্ত হওয়ার দরুণ মস্তিষ্কে ব্যাধি সংক্রমণের ফলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বহু শিশুকে ধ্বংস করতো। লালজ্বর বা ডিপথিরিয়ার চাইতে হাম কম মারাত্মক হ'লেও শিশুমৃত্যুর হার বাড়িয়ে দিত।

বসন্ত হ'চ্ছে একমাত্র সংক্রামক রোগ যাকে প্রতিরোধ করবার উপায় চিকিৎসা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট ছিল। গোবীজে টিকা দান চিকিৎসকদের জানা ছিল কিন্তু খুব সুষ্ঠুভাবে টিকাদান পদ্ধতি তখনও পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত হয় নি। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরভাবে টিকা না দেওয়ার ফলে কখনও কখনও রোগ সংক্রামিত হ'ত এবং এই কারণেই রোগ দমনের যথার্থ ক্ষমতা সম্বন্ধে লোকের মনে সংশয় এনে দিত।

তখনকার দিনে, যেমন আজকের দিনেও বটে, যক্ষ্মা এক সর্ব্বজনীন অভিশাপ। এই রোগেরও নিদানতত্ত্ব অজ্ঞাত ছিল এবং সাধারণতঃ এ রোগ সম্বন্ধে এই ধারণাই পোষণ করা হ'ত যে, এটি একটি সহজাত রোগ—স্থানিক কোন দৈহিক যন্ত্রের ক্রিয়া বা গঠনের ক্ষতিকর বিকৃতি একটি গৌণ ব্যাপার। এই রোগের বিস্তার অবধারিত, এমন কুসংস্কার তখনকার দিনে প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত রোগের প্রাদুর্ভাব সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটত ব'লে লোকে বিশ্বাস করত। কেবলমাত্র স্বাভাবিক অজ্ঞতা যদি পূর্ব্বোক্ত চিন্তাধারার দ্বারা প্রণোদিত না হ'ত তাহলে যক্ষ্মা রোগ যে এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয় এই সত্য বংশ পরম্পরায় লোকেদের অন্ধ ক'রে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট হ'ত না। এই রোগ যে কতখানি সর্ব্বনাশ ঘটাতো তা আমাদের প্রতিবেশী একটি পরিবারের বিষাদময় ইতিহাস থেকে সুপরিস্ফুট হ'বে। এই পরিবারটি আট বছরে যক্ষ্মা রোগে তাদের ন'টি শিশুর মধ্যে আটটিকে হারায়। আমি আমার বাবার সঙ্গে একবার ঐ পরিবারের সঙ্গে দেখা

করতে গিয়েছিলাম। রোগের চরম অবস্থায় শয্যাশায়ী মা এবং তাঁর তিনটি শিশু সন্তানকে একটি তিন কামরা বিশিষ্ট ছোট চালাঘরে পৃথক ক'রে রাখা হয়েছিল। পরিবারের মধ্যে যারা রোগাক্রান্ত হয় নি তারা ইচ্ছামত এখানে-ওখানে খেলা ক'রে বেড়াত।

তদানীন্তন কালে রোগ দমন করার পক্ষে সব চাইতে বড় বাধা দেখা দিত এই জন্য যে, জীবাণুসংক্রান্ত কারণগুলিকে স্বীকার করে নেওয়া হ'ত না। সেই জন্য যে ব্যক্তির সংক্রামক ব্যাধি হয়েছে তাকে অন্য সকলের থেকে পৃথক রেখে রোগ প্রতিরোধ করবার কোনও চেষ্টাই হয় নি। বছরের বিশেষ একটি ঋতু, আবহাওয়ার অবস্থা এবং আরও অনেক কিছুই এই রোগের কারণ ব'লে লোকে বিশ্বাস করতো—অন্ততপক্ষে এমন একটি কারণ তো বটেই যা মানুষের শক্তির গণ্ডীর বাইরে।

যে সমস্ত রোগ মহামারীর পর্য্যায়ে পড়ত না তাদেরও চিকিৎসা তখনকার দিনের চিকিৎসকদের দ্বারা এর চাইতে ভালভাবে হ'ত না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ব্যাপকভাবে আঙ্গিক প্রদাহ নির্দ্দিষ্ট হওয়ার পর রোগ চরম অবস্থায় এসে পৌঁছত ততক্ষণ পর্য্যন্ত উদর সম্বন্ধীয় মারাত্মক রকমের সংক্রামক রোগ ধরাই পড়ত না। তখনকার দিনে কোন রোগে রোগীর মৃত্যু হয়েছে, তা নির্ণয় করবার জন্য মৃতদেহের উপর পরীক্ষা ক'রে দেখবার অনুমতি দেওয়া হ'ত না—কেননা এই ধরণের কার্য্য-কলাপকে অপবিত্র মনে করা হ'ত। কেউই মুক্তাসদৃশ নির্ম্মল তোরণের মধ্যে নানাবিধ নাড়ীভুঁড়ি ভর্ত্তি ঝুড়ি নিয়ে প্রবেশ ক'রতে চাইত না। এর ফল এই দাঁড়াত যে, অনেক ক্ষেত্রেই ডাক্তারেরা এমনকি রোগীর মৃত্যুর পরেও কি রোগে রোগীর মৃত্যু হ'ল, তার কারণ নির্দ্ধারণ ক'রতে পারতেন না এবং সেই জন্য বংশ পরম্পরায় এমনকি শতাব্দীর পর শতাব্দী সেই ভুলেরই পুনরাবৃত্তি চ'লত।

গ্রাম্য অঞ্চলগুলিতে দৈহিক যন্ত্রের ক্রিয়া বা সামান্যতম বিকৃতির জন্যও দেহে অস্ত্রাদি প্রয়োগের ব্যবস্থা প্রায় অবিদিতই ছিল। তখনকার দিনে সব ক্ষতের মধ্যেই পুঁজ জমত। তখনকার দিনে অস্ত্র চিকিৎসক-দের প্রিন্স অ্যালবার্ট কোট প'রে রোগীর দেহে অস্ত্রোপচারের খুব রেওয়াজ ছিল—কেননা তখন ঐ পরিচ্ছদই ছিল চিকিৎসা-বৃত্তির একমাত্র উপযুক্ত পরিচ্ছদ। বিশেষ সাবধানীরা নিজেদের আস্তিনের হাতা গুটিয়ে নিতেন। আমি প্রথম যে অস্ত্রোপচার দেখেছিলাম তাতে লক্ষ্য করি যে, অস্ত্রচিকিৎসক ছুঁচে সিল্কের সুতো পরিয়ে নিয়েছিলেন এবং ঐ ছুঁচ বুকের কাছে কোটের যে অংশ পাশে ভাঁজ করা থাকে তাতে আটকে রাখতেন, যাতে যখনই দরকার হবে তখনই তা যেন হাতের কাছে পান। ব্যবহারের আগে অস্ত্রোপচারের ছুরিটি দাঁতে চেপে রাখতেন।

সুতরাং এ থেকে সহজেই বোঝা যাবে কেন সমস্ত ক্ষতেই পুঁজ জমতো। যে সমস্ত ক্ষত আজকের দিনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য ব'লে মনে হয় তাদেরও চিকিৎসা করা হ'ত শরীরের অংশ বিশেষ কেটে বাদ দিয়ে। আমার মনে আছে একটি থেঁতলানো হাতের চিকিৎসা করা হয়েছিল হাতখানি কেটে বাদ দিয়ে এবং জানুসন্ধির অধস্থ বৃহৎ পদাস্থির সামান্য 'জটিল অস্থিভঙ্গ' এই ভাবেই সারানো হয়েছিল উরুর মাঝামাঝি থেকে পা কেটে বাদ দিয়ে। বাস্তবিক পক্ষে জটিল অস্থিভঙ্গের চিকিৎসা করার চলতি রেওয়াজই ছিল শরীরের অঙ্গ বিশেষ কেটে বাদ দেওয়ায় এবং বড় বড় অস্থি সন্ধিগুলির জখম সারাতে হ'লে প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই পন্থা অবলম্বন করা হ'ত। এইভাবে রোগের মূল উৎপাটন ক'রে চিকিৎসা করার কারণই ছিল যে, চিকিৎসকেরা, যাঁদের বেশ দূর থেকেই ডেকে আনা হ'ত, বুঝেছিলেন যে ক্ষতে পুঁজ হওয়ার দরুণ শরীরের অঙ্গ-বিশেষ কেটে বাদ দেওয়াই ছিল সব চাইতে সেরা পন্থা। ক্ষতের প্রতি যত্ন নেওয়ার জন্য কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকত না। অভিজ্ঞতা

থেকে দেখা গিয়েছিল যে, শরীরের অঙ্গ বিশেষ কেটে বাদ না দিলে সংক্রমণ থেকে মৃত্যু হওয়া অবধারিত ছিল যদিও বহুক্ষেত্রে শরীরের অঙ্গ-বিশেষ কেটে বাদ দিয়েও মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া শক্ত ছিল কেননা অঙ্গচ্ছেদ করবার পর যে ক্ষতের সৃষ্টি হ'ত প্রায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা সংক্রামিত হয়ে পড়তো এবং রোগীকে মৃত্যুর কবলে নিয়ে যেত। দেহের রক্তরসাদির শিরাগুলিকে লম্বা লম্বা করে কাটা সিল্কের সুতো দিয়ে সেলাই করে দেওয়া হ'ত তাতে ক'রে শিরাগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর ঐ সুতোগুলোকে টেনে বের ক'রে নেওয়া যেত অবশ্য দ্বিতীয়বার রক্তস্রাবের পরও যদি রোগী না মারা যেত।

কী ভাবে সংজ্ঞাহীনতা উৎপাদন ক'রতে হয়, তা তখনকার দিনেও জানা ছিল। ১৮৪৬ সাল থেকে ইথার (ether) ব্যবহার করা সুরু হয় এবং ক্লোরোফর্মের (chloroform) ব্যবহার সুরু হয় ১৮৭২ সাল থেকে। যদিও গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত ক্ষতের চিকিৎসা ক'রতে চামড়ার উপরে সেলাইয়ের প্রয়োজন হ'ত, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত ওষুধগুলি কদাচিৎ ব্যবহার করা হ'ত। দেহের কাটা স্থানটি কেবলমাত্র সেলাই ক'রে দিয়েই চিকিৎসকগণ ক্ষান্ত হ'তেন। জীবনের প্রতি রোগীর দৃষ্টিভঙ্গী কি রকম তা জেনে নেওয়ার পক্ষে এই সময়টিই উপযুক্ত ছিল। কেউ কেউ মদ্যপান ক'রে বেঘোর হ'তেন, কেউ কেউ দিতেন অভিসম্পাত আর কেউ কেউ প্রার্থনা করতেন এবং অনেকে আবার একসঙ্গে তিনরকমই ক'রতেন। কিন্তু চিকিৎসকেরা বেদনা ভোগ করার সময় কমিয়ে ফেলবার জন্য খুবই দ্রুতগতিতে কাজ ক'রতেন। ছেদনজনিত মাথার খুলির চিকিৎসা ক'রতে দেখি কেবলমাত্র ক্ষতের উপরের ছোট ছোট চুলের গুচ্ছকে পরস্পরের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে। খুবই সোজা উপায় এবং এক্ষেত্রে খুবই কার্য্যকরী। কিন্তু যে সমস্ত

লোকের মাথায় টাক থাকত তাঁরা কষ্ট ডেকে আনতেন এবং তার ফলে খুলির উপর ক্ষতের সৃষ্টি হ'ত।

আমার বাল্যকালে চিকিৎসা-বিজ্ঞান কি রকম অবস্থায় ছিল এবং চিকিৎসা প্রণালী কিভাবে চ'লত, উপরে তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল। আমার বর্ত্তমান জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে যখনই আমি পুরাণো দিনের কথা ভাবি, তখনই মনে পড়ে যে, সম্ভবতঃ কেবলমাত্র ম্যালেরিয়া এবং খোস পাঁচড়া ছাড়া ডাক্তাররা সে যুগে অন্য কোনও রোগই যথার্থ সারিয়ে তুলতে পারতেন না। কেমন ক'রে যন্ত্রণা কমাতে হয়, হাড়-গুলি ঠিক ঠিক জায়গায় কি ভাবে বসাতে হয় এবং ছোট ছেলে-মেয়েদের ফোড়াগুলো কিভাবে চিরে দিতে হয় ডাক্তাররা তা জানতেন। সম্ভবতঃ তখনকার দিনের চিকিৎসকেরা প্রসব করানর ক্ষেত্রেই সব চাইতে বেশী সেবার পরিচয় দিতেন। আমি এমন একজন চিকিৎসককেও জানি না যিনি এই সমস্ত ক্ষেত্রে রোগী দেখতে আসতে অস্বীকার ক'রেছেন, যদিও চিকিৎসা ক'রতে যাওয়ার অর্থ চিকিৎসকের পক্ষে প্রভূত শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করা। এমন কি সময়ে সময়ে জীবন বিপন্নও করতে হ'ত। দারুণ দুর্ব্বিপাকের সময়ে আকুলভাবে চিকিৎসকের উপস্থিতি প্রতীক্ষা করা হ'ত। চিকিৎসক তাঁর সাধ্যমত সব কিছুই ক'রতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মানবজাতি যে ক্রমশঃ খৃষ্টান আদর্শের দিকে এগোচ্ছে তার সবচেয়ে আশার লক্ষণ হ'চ্ছে যে, শিশুদের সম্বন্ধে তাদের মনো-ভাবের পরিবর্তন। এখন গুণগত উৎকর্ষের দিকে মনোযোগ

দেওয়া হ'চ্ছে। মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে এ নিয়ে মোটেই মাথাব্যথা নেই এবং সভ্যজাতির কাছেও এ অপেক্ষাকৃত নতুন। অনেকেই আজকে বুঝতে পারছেন যে, শিশুসন্তানদের প্রতি তাদের পিতা-মাতার একটা অবশ্যকর্তব্য আছে, কারণ নিজেদের জন্মের জন্য এই শিশুসন্তানরা দায়ী নয়। তবুও এখনও অনেক অনাদৃত শিশু আছে যারা আজও সেই অৰ্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেকার আবহাওয়ার মধ্যেই তাদের বাল্যজীবন অতিবাহিত করছে। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, সেই পুরণো অবস্থাই আজও বজায় রয়েছে এবং তার বিশেষ কিছু বদল হয় নি বললেই চলে।

আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে শিশুরা প্রায়ই অনাদৃত অবস্থায় থাকত তার কারণ যে ঠিক পিতামাতার স্নেহের অভাব তা বলা যায় না বরং তখনকার সামাজিক রীতিনীতি তার জন্যে বেশী দায়ী। "না পিটোলে ছেলে হয় না" "মেরে ধরে শক্ত করা" ইত্যাদি প্রবাদগুলি নিশ্চয় শুনে থাকবেন—তার উদ্দেশ্য হয়ত ভাল ছিল কিন্তু ফল হ'ত এই যে ছেলেরা হয়ত শক্ত হত কিন্তু তারা বিগড়ে যেত।

জীবনসংগ্রামের ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যাপারেও শিশুদের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। সাধারণতঃ শিশুদের সহজাত অধিকার ব'লে কিছুই ছিল না। শিশুর জন্ম দিয়েই পিতামাতার দায়িত্ব শেষ হ'ত। সকল ক্ষেত্রে শিশুর উপস্থিতির কারণ ছিল আর্থিক প্রয়োজনীয়তা এবং যত শীঘ্র সম্ভব তাকে কাজে লাগিয়ে দেওয়া।

শিশুদের বাঁচামরা নির্ভর করত পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। দুর্ব্বলরা বাঁচত না—অপেক্ষাকৃত সবলরা টিঁকে যেত। ব্যাপারটা যতটা শ্রুতিকটু হয়ত ততটা খারাপ ছিল না তবে পিতামাতা এইটি বুঝতেন যে মিছিমিছি ডাক্তার ডাকা মানে অর্থের অপচয় করা। যতদূর মনে পড়ে ছেলেবেলায় রোগের লক্ষণ দেখে ডাক্তার বলেছিলেন,

ভোর হওয়ার আগেই আমি মারা যাব। ডাক্তার সম্বন্ধে আমার এই প্রথম অভিজ্ঞতা। শুনেছি তিনি নাকি আরও বলেছিলেন, "আহা ছেলেটিকে বেশ চালাক-চতুর ব'লেই মনে হয়।" আমি সেই ডাক্তারবাবুর অভিমতটি আমার মনে রেখে দিয়েছি সব সময়ে, কারণ তিনি ছাড়া আর বিশেষ কেউ একথা বলেছেন বলে মনে হয় না।

স্কুলে প্রথম দিনের কথা মনে পড়লে বেশ মজা লাগে। বাড়ীতে আমার দিদির কাছে আমি লিখতে পড়তে শিখেছিলাম। স্কুলে প্রথম দিনেই নরম পাইন কাঠের ডেস্কে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে সেদিনকার তারিখটা লিখলাম ২৬শে নভেম্বর ১৮৭৭—অক্ষরগুলো দু' ইঞ্চি সাইজের। তার সারার্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে সাড়ে সাত বছর বয়সের একটি ছেলের কাছে যথেষ্ট ধারালো একখানি ছুরি ছিল এবং সে তা ব্যবহার করতেও পারত। এ থেকে সুযোগ উপলব্ধি করার তীক্ষ্ণ শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। অভ্যাসের দ্বারাই এটি অর্জন করা যায়। অথচ তার জন্যে স্কুলে আমি মার খেয়ে মরলাম। আমার এখনও মনে হয় স্কুলে প্রথম দিনের কাজ হিসেবে ওটা বেশ কৃতিত্বের পরিচায়ক। আজকের যুগে ঐ বয়সের ছেলে ঐ ধরণের কাজ করতে পারে এমন বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। ওতে যন্ত্রপাতির ব্যবহার জানা এবং কোনও কাজ নিজের হাতে করতে পারার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

স্কুলে এই প্রথম দিনের ঘটনার মধ্যেই আমার সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হ'য়ে আছে বলা চলতে পারে।

গাঁয়ের স্কুলের শিক্ষাদান তখন তিনটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল,. লেখা, পড়া এবং অঙ্ক কষা। ছেলেরা নিজেরা অবশ্য এর সঙ্গে নানান-রকম খেলাধূলো করত—শিকার-শিকার খেলা, শিকার জালে ফেলা, মারামারি খেলা ইত্যাদি। বাস্তবিক পক্ষে জীবন সংগ্রাম জিনিষটাই

এখন ঠিক তাই, কোন একটা জিনিষের সন্ধানে ছোটা, সেটাকে পাওয়া এবং তারপরে তাকে বজায় রাখার জন্যে লড়াই করা।

আজকের দিনের আর একটা খুব হিতকর কাজ হ'চ্ছে অস্বাভাবিক শিশুর সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। আগেকার কালে অস্বাভাবিক কিছু হ'লে "পেঁচোয় পাওয়া" বা ঐ ধরণের কিছু ব'লে দেওয়া হ'ত। তখন স্কুলে নার্সেরও বালাই ছিল না। এবং ডাক্তাররাও ছেলেদের ঠিক কি দোষ তা ধরতে সক্ষম ছিলেন না। খ্যাতনামা স্যার জেম্‌স্ ম্যাকেঞ্জী এ সম্বন্ধে একটি ঘটনা বলেন যা আমার অভিজ্ঞতারই অনুরূপ। তিনি বলেন, তিনি দূরের জিনিষ দেখতে পেতেন না ব'লে তাঁকে অনায়াসে বোবার দলে ফেলে দেওয়া হ'য়েছিল এবং তিনি প্রতিবাদ না করে সেটা নীরবে মেনে নিয়েছিলেন। আমার নিজের হয়েছিল প্রায় তাই—স্কুলে ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা দেখতে পেতাম না ব'লে সাধারণতঃ ধরে নেওয়া হ'ত যে আমার পড়াশুনোয় মন নেই—এবং তার জন্যে বেশ ক'রে বেত্রাঘাত করা হ'ত আমাকে। তখন বেত্রাঘাতই সমস্ত রোগের ওষুধ ব'লে স্থির করা হয়েছিল। এই বেত্রাঘাত আমাকে প্রতিহিংসাপরায়ণ ক'রে তুলত।

এই ধরণের কতকগুলি কাজেতে আমার একটি সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ হয়—যেটি আমি পরে কাজে লাগাতে পেরেছিলাম। তার প্রধান কয়েকটি হ'চ্ছে যেমন—বিপদে পড়লে অযথা চীৎকার না করা, এবং কোন কাজ সুরু করার পূর্ব্বে ফলাফল কিছুটা ভেবে নেওয়া—বলাবাহুল্য অস্ত্রচিকিৎসকের পক্ষে অত্যন্ত দামী শিক্ষা এগুলি। এইগুলো সম্বন্ধে পাছে কিছু ভুল ধারণা ক'রে বসেন তাই এ সম্বন্ধে কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছি।

যেমন ধরুন, আমাদের একটি ন্যাকড়ার বল ছিল, এবং যখন ক্লাশ চলত তখন শিক্ষয়িত্রীকে লুকিয়ে এইটি নিয়ে লোফালুফি

করা হ'ত। কিন্তু শিক্ষয়িত্রী অবশ্য মাঝে মাঝে দেখে ফেলতেন। যদিও 'এই আছে এই নেই' গোছের হঠাৎ লুকিয়ে ফেলা হ'ত বলটিকে। শিক্ষয়িত্রী বহুদিন ধ'রে এই বলটিকে পাকড়াও করবার চেষ্টা করছিলেন। একদিন আমি এই বলটিতে একটি সুতো বেঁধে মেঝের উপর দিয়ে গড়িয়ে ঘরের সামনের দিকে ছুঁড়ে দিলাম। শিক্ষয়িত্রী বলটি ঠিকই দেখতে পেয়েছিলেন এবং "যাক এইবার পেয়েছি" ব'লে বলটি ধরতে উঠলেন। কিন্তু তিনি বল সংলগ্ন সুতোটি দেখেন নি। যেই তিনি হেঁট হ'য়ে বলটা ধরতে গেলেন অমনি আমি সুতোয় একটু ঝটকা টান দিতেই তিনি দেখলেন তাঁর হাতটা ফসকে গেল এবং বলটাও উধাও হ'য়ে গেল। তিনি সবাইকে প্রশ্ন করলেন কিন্তু বলটা কোনও সময়ে কেউ দেখেছে এমন কথা কেউ স্বীকার করল না। তিনি তার শোধ তুললেন সবাইকে প্রহার দিয়ে। তিনি মেঝেতে একটি গর্ত্ত লক্ষ্য করেন নি। কোন নিষিদ্ধ জিনিষ লুকোবার দরকার হ'লে আমরা এই গর্ত্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে তখনকার মতন সেটাকে সরিয়ে ফেলতুম। তারপর স্কুলের বাইরে দিয়ে ঘুরে সুড়ঙ্গের মধ্যে থেকে হামাগুড়ি দিয়ে সেই সব জিনিষগুলি উদ্ধার ক'রে আনা হ'ত।

আমাদের শিক্ষয়িত্রী বেশ বয়স্কা এবং লম্বা চওড়া দেখতে ছিলেন। একদিন তিনি বললেন এ রকম বদমাইস্ ছেলের পাল্লায় তিনি এর আগে পড়েন নি। তিনি আর আমাদের পড়াতে রাজী হ'লেন না। এইবার ভীষণ আকৃতির এক পুরুষ শিক্ষক নিযুক্ত হ'লেন এবং তিনি এসেই বললেন, যে কোনও দলকে তিনি ঠাণ্ডা করতে পারেন। প্রথম দিনেই দেখলাম দরজার উপর একটি কাগজ আঁটা তাতে আঠারটি জিনিষ লেখা আছে যা আমাদের করা নিষিদ্ধ। তিনি সেগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। লিষ্ট পেয়ে আমাদের সুবিধেই হ'ল—

প্রথম দিনেই সতেরটি নিষিদ্ধ নিয়ম লঙ্ঘন করা হ'ল। আঠারটাই লঙ্ঘন করা হ'ত কিন্তু সময় পাওয়া যায় নি। আমার মনে আছে আমার সারা স্কুলজীবনের ইতিহাসে সেই দিন আমি সবচেয়ে কর্মব্যস্ত ছিলাম।

সে যুগে আর একটি বেশ মজার খেলা ছিল। একটি ছেলে তার জুতোর সামনে একটি আলপিন আটকে তারপর পা বাড়িয়ে তার সামনের সীটে বা আরও দু'চারটে সীট আগের কাউকে খোঁচা মারত। তখন যে ছেলেটি খোঁচা খেয়েছে সে পিছন ফিরে আন্দাজে কাউকে সন্দেহ ক'রে হাতের খোঁচা মারত। যদি সে ভুল ক'রে অন্য কোন ছেলেকে ধরত তাহ'লে ক্লাসের পর সে সম্পর্কে মীমাংসা করা হ'ত। অবশ্য এখন এসব খেলা বোধ হয় সুপরিচালিত স্কুলে আর চলে না।

স্কুলপালানো খেলা হ'ত প্রায়ই এবং সেই সময়টা খরগোস শিকার এবং স্কেটিং করে কাটান হ'ত। আজকাল বাপ-মায়েরা ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে যান এদিক ওদিক বেড়িয়ে দেখাবার জন্যে। আমরা কিন্তু নিজে নিজেই বেড়াতুম। কামাইয়ের জন্যে যাহোক্ একটা কৈফিয়ৎ দিলেই শিক্ষক খুসী থাকতেন কারণ আর যাই হোক অন্ততঃ একটা দিনের জন্যেও ক্লাসটা একটু শান্ত থাকত এইতেই তিনি খুসী। আমার এক নাতির কাছ থেকে শুনলাম আজকাল নাকি স্কুলপালানো খেলার প্রচলন আর নেই। কথাটাই উঠে গেছে এবং তার বদলে "অনুপস্থিত" বা ঐ ধরণের কোন শ্রুতিমধুর কথার প্রচলন হ'য়েছে। এই ক'রেই সভ্যতা এগিয়ে চলে।

পরের বছর আমরা যাকে শিক্ষয়িত্রী হিসেবে পেলাম তিনি ছিলেন ভারি চমৎকার লোক। তিনি বেতের ধার দিয়েও গেলেন না এবং প্রথমেই বললেন তাঁর নাম লিলি এবং কেউ যেন তাঁকে দিদিমণি ব'লে না ডাকে। আমাদের সমস্ত দুষ্টামী বন্ধ হ'য়ে গেল এবং আমাদের মধ্যে কেউ কখনও এমন কোনও কাজ করে নি যাতে ক'রে তিনি চ'টে যান।

এই শিক্ষয়িত্রীটি দেখতে বেশ ছোটখাট ছিলেন। তাঁর দেহের ওজন একশ' পাউণ্ডও বোধ হয় হ'বে না। বরফের উপর দিয়ে পাছে তাঁর আসতে অসুবিধা হয় সেই জন্যে আমরা রোজ বরফের উপর একটা রাস্তা ক'রে রাখতুম। রোজ মারধোর ক'রে যখন ঠাণ্ডা করা গেল না, তখন এই শান্ত শিক্ষয়িত্রীটি তাঁর ভালবাসা দিয়ে আমাদের জয় ক'রে ছিলেন। তাঁর দয়ালুতাই আমাদের কাছে আশ্চর্য্য লেগেছিল। ঐ ধরণের ব্যবহার আমরা কেউ কখনও পাই নি। আমরা সকলেই তাঁকে ভালবাসতাম, কিন্তু আমরা তখন ভালবাসা কথাটার ঠিক অর্থ বুঝতে পারতাম না। পাদ্রীমশাই অবশ্য মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন আমরা যীশুকে ভালবাসি কিনা কিন্তু আমরা সে কথাটা তখন ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না।

প্রায় এই সময় নাগাদ আমি বইয়ের আনন্দ বুঝতে শিখি। কি ক'রে যেন আমার হাতে ডাক্তার ফুট্-এর লেখা "গৃহচিকিৎসক" ব'লে একটা মলাট-ছেঁড়া বই এসে পড়ল। এক পাদ্রীমশাই আমাকে সেই বই পড়তে দেখে বইটি আগুনে ফেলে দিলেন। কিছুদিন পরে জানলাম যে তাঁর বইটা পুড়িয়ে দেওয়ার কারণ ছিল যে, বইটিতে রোগ ইত্যাদি বর্ণনা করতে গিয়ে নারী এবং পুরুষের প্রভেদ বোঝান ছিল। একটি চাষীর ঘরের ছেলের পক্ষে অবশ্য সে সব জানার কোনও সম্ভাবনাও ছিল না। সেই পাদ্রী ভদ্রলোকই আবিষ্কার ক'রেছিলেন যে আমার এবং আমার ভাইয়ের একটি লুডো আছে—এগুলোও তিনি আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে আমার বাবাকে বুঝিয়ে বললেন যে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে তাস খেলা ইত্যাদি। শুনেই আমাদের মাথায় নতুন বুদ্ধি খেলল। আমার এক কাকার কাছে থেকে তাস জোগাড় ক'রে তাঁর কাছেই খেলাটা শিখলাম এবং সময় পেলেই লুকিয়ে তাস খেলতে শুরু করলাম। তার ফলে ষোল বছর বয়সে জেলার সবচেয়ে ভাল খেলিয়েকে হারিয়ে দিলাম।

তারপর ২০ বছর পর্য্যন্ত তাস আর মোটেই ছুঁইনি। লুডো খেলতে থাকলে এটা কি আর সম্ভব হ'ত? তারপর মিস মুলকের লেখা "একটি ভদ্রলোক জন হ্যালিফ্যাক্স" নামে একটি বই পাই—সেটিও পুড়িয়ে দেওয়া হয় যেহেতু সেটি একটি উপন্যাস। তার ফল হ'লো এই দশ সেণ্ট দামের বই পড়তে সুরু করলাম। ছোটবেলায় কিছু পড়তে না পাওয়াই এই সব বই পড়ার কারণ মনে হয়। এই ভাবে পাদ্রী মশাই আমার শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করেন।

বার বছর বয়সে ঐ ছোট লাল রঙের স্কুলটি ছেড়ে গাঁয়ের অনতি-দূরে সহরে স্কুলে যেতে সুরু করলাম। কিন্তু ধানকাটা না হওয়া অবধি স্কুলে যেতে পারলাম না। অর্থাৎ স্কুল খোলার দু'মাস বাদে গিয়ে ভর্ত্তি হলাম। তাতে খাটুনী হ'ল ডবল। যা রোজকার পড়া তাও পড়তে হ'চ্ছে আবার পুরণো পড়াও পড়তে হ'চ্ছে। অঙ্কর ক্লাশে তখন ঘনমূল অঙ্কের অর্ধেকটা করান হয়ে গেছে। আমি তখন বর্গমূলের অঙ্কই জানতাম না। আর একটা জিনিষও আবিষ্কার করলাম—বন্ধু। আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড় ঐ সহরেরই একটি সুন্দরী মেয়ে আমাকে সমস্ত পুরণো পড়া তৈরী করতে সাহায্য করতে লাগল। অত সুন্দরী মেয়েও আমি আগে দেখি নি। মেয়ে ছাড়া বোধ হয় আর কেউই এর কারণ বলতে পারবে না যে কেন ঐ চমৎকার মেয়েটি তার পক্ষচ্ছায়ায় একটি অবহেলিত ছেলেকে আশ্রয় দিল। যাই হোক এইটুকু অন্ততঃ হ'ল যে বছরের শেষে দেখা গেল শুধু পাটীগণিতেই নয়, বীজগণিতেও আমি ক্লাশের মধ্যে প্রথম হ'য়েছি।

এই ক'বছর স্কুলের শিক্ষার সঙ্গে আমার আর একটা শিক্ষাও হ'য়েছিল। জমিজমার কাজ ত ছিলই। এগারো বছর বয়সে আমি লাঙল দিতে শিখলাম এবং বারো বছর বয়সে নিয়মিত ভাবে দৈনিক দশঘণ্টা ক'রে লাঙল দিতাম। আমায় কাজ করতে হ'ত একটা বুড়ো ঘোড়া

এবং তার এক বেজায় বেয়াড়া বাচ্ছা নিয়ে। বাচ্ছাটা সোজা লাঙলের রাস্তা ছাড়া আর যেদিকে খুসী যেতে চাইত। তাতে ক'রে লাঙল এবং ঘোড়া এই দুটির গতির দিকে নজর রাখতে আমার খাটুনী হ'ত ডবল। এখন এই দুর্ব্বল ক্ষীণ শরীরে এখনও আমার সেই দিনগুলো দুঃস্বপ্নের মতন মনে জেগে আছে। হোরেস ম্যান্-এর মত আমিও বলতে পারি যে ছেলেবেলাটা বড় বেশী পরিশ্রমের মধ্যে দিয়েই কেটেছে।

বছরের অন্যান্য সময়টা খাটুনী কম থাকলে একটু আমোদ-প্রমোদের সুযোগ পেতাম। হঠাৎ দল ছেড়ে, ঘোড়া ছুটিয়ে বেশ খানিকটা দৌড়ে আসতে বেশ মজা পেতাম। জিনে ব'সে থেকেই মাটী থেকে একটা ফুটি বা ঐ রকম কোন ফল চট ক'রে কুড়িয়ে নেওয়া গোছের শক্ত শক্ত খেলা আমি অনায়াসেই করতে পারতাম। ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়া ঐ খেলারই একটি অঙ্গ। কাল্পনিক জীব-জানোয়ার শিকার ক'রতে রাত্রে বেরুতেও বেশ লাগত। শেষকালে হয়ত একটা ছোট মুরগীর বাচ্ছা ধার ক'রে চেয়ে এনে রান্না ক'রে খেতাম। আধ কাঁচা, আধ পোড়া, কিন্তু মুখে লাগত যেন অমৃত। এখনকার বয় স্কাউটরা যা কিছু করে তার অনেক জিনিষই আমরা নিজে থেকেই করতাম। আরও কত যে বদমাইসির খেলা খেলেছি সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তা সব লোপ পেয়ে যাচ্ছে; তবে এখন নাতি নাতনীর ঠাকুর্দ্দা সেগুলিকে মনে ক'রে রাখার যোগ্য বলে বিবেচনা করেন না। তবে এটা ঠিক যে তাতেও কিছু না কিছু শিক্ষা হ'ত।

সহরের স্কুলে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য ব'লে বিশেষ কিছু ছিল না। যার যেটা ভাল লাগত সেটাই সে পড়ত। এইটা আগে এইটা পরে এই ধরণেরও কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না—আগে পরে যখন হোক পড়লেই হ'ল। চার বছরে স্কুলের সমস্ত পাঠ সাঙ্গ ক'রে আমি কাছাকাছি আর একটা সহরে একটা স্কুল খুঁজে বার করলাম। সেই সহরে আমার এক কাকার

কামারের দোকান ছিল। এই কাকা যখন জানতে পারলেন যে চাষবাসের চেয়ে আমি পড়াশোনা করতেই বেশী ভালবাসি তখন আমায় বললেন তাঁর কাছে থেকে সেই স্কুলেই পড়াশোনা করতে। থাকা-খাওয়ার পরিবর্তে অবশ্য আমাকে দুধ দোওয়া, ঘোড়াগুলির দেখাশোনা করা এবং একটি আটসেরী হাতুড়ী দিয়ে কারখানায় মাঝে মাঝে লোহা পেটান দেওয়া প্রভৃতি কাজ করতে হ'ত।

স্কুলে যখন ভর্ত্তি হলাম তখন ছ'সপ্তাহ ক্লাশ সুরু হয়ে গেছে এবং অন্যান্য ছাত্ররা এগিয়ে যাওয়ার জন্যে অবশ্য অসুবিধেই হ'তে লাগল। রোজকার এবং আগেকার পড়া তৈরী করতে হ'ত! অঙ্কর জন্যে আটকাত না কিন্তু ল্যাটিনকে নিয়েই হ'ল মুস্কিল। ল্যাটিন ভাষায় যখন "ভালবাসি, ভালবাসিয়াছিলাম, ভালবাসিয়াছি" ব'লে পড়তাম তখন আমার ভয়ানক লজ্জা করত আর ক্লাশের মেয়েগুলো খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠত। এখনকার মেয়েরাও বোধ হয় অমনি ক'রেই হেসে ওঠে। ওখানে জ্যামিতিতে শিখলাম যে "সরল রেখা হ'চ্ছে দুটি বিন্দুর মধ্যে সবচেয়ে কম দূরত্ব"। আমার মনে হ'ল এ ত' জানা কথা—মাঠে কাজ করতে করতে খাওয়ার ঘণ্টা পড়লে আমি কতবার সোজা দৌড় মেরে সেটা প্রমাণ ক'রে দিয়েছি।

তখনকার দিনে সাধারণতঃ ল্যাটিন, গ্রীক, অঙ্ক এবং ইংরিজী শেখানো হ'ত। গ্রীক সম্বন্ধে আমার এইটুকুই শুধু মনে আছে যে, "ক্রিয়া" শুধু একটি, ডেরিয়াসের তিনটি বড় বড় ছেলে ছিল এবং শকুনির মাংস হরিণের মাংসর চেয়েও মিষ্টি খেতে। যাই হোক, আমাকে যদি আবার গোড়া থেকে ডাক্তারী পড়তে বলা হয় তাহ'লে আমি আবার ঐ ল্যাটিন এবং গ্রীক দিয়েই সুরু করব। যদিও (অনেকটা সেক্সপীয়ারের মত) সামান্য ল্যাটিন এবং আরও সামান্য গ্রীক জানতাম—কিন্তু তবুও ডাক্তারী জিনিষপত্রের নামধাম পড়তে এবং বুঝতে বেশ সহজ লাগত। ওষুধের

নাম যখন পড়তে সুরু করলাম—তখন কোন্ শব্দ থেকে কোন্ শব্দ তৈরী হ'য়েছে সেটাও বেশ বুঝতে পারলাম। পরীক্ষা বা আবৃত্তি ইত্যাদির সময় হঠাৎ আটকে গেলে সেই বিষয়টির কোন একটি বিশেষ শব্দ নিয়ে তার উৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা যায়। ততক্ষণে মাথাটা সাফ ক'রে নেওয়া যায়। এতে শিক্ষককেও মুগ্ধ করা যায়, বিশেষ করে যদি সেই শিক্ষক সেই কথাটির উৎপত্তির ইতিহাস না জানেন। পড়া ধরলেই এই রকম যে কোনও একটি কথার ইতিহাস ব্যাখ্যার নাম ক'রে পাঁচ মিনিট সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। একবার এক শিক্ষকের উপর এই চালটি চেলেছিলাম—অবশ্য তিনি যে এককালে গ্রীক ভাষার শিক্ষক ছিলেন তখন আমি তা' জানতাম না। সাধারণতঃ এতে কাজ বেশ ভালই হ'ত। একথা অবশ্য বলতে চাই না যে আমার ক্ষেত্রে এটার প্রয়োজন ছিল কিন্তু এই জ্ঞানটা থাকার জন্যে মন বেশ সন্তুষ্ট থাকত যেমন প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা টাকা পকেটে থাকলে মনটা খুসী থাকে। তা ছাড়া এই সামান্য গ্রীক জানা থাকায় ডাক্তারী নাম ইত্যাদি পড়তে বেশ ভালই লাগত।

প্রথম দু'বছর আমার থাকা খাওয়ার দরুণ কাজ করতে হ'ত। নানান কাজের মধ্যে একটি হচ্ছে একটা গুড়ের চৌবাচ্ছা ছিল, তার নীচে আগুন থাকত, সেটি আমাকে জ্বালিয়ে রাখতে হ'ত। এই সময়টা আমি কাজে লাগাতাম জ্যোতিষশাস্ত্র প'ড়ে। একটি লণ্ঠনের সাহায্যে বইয়ের মধ্যে আমি নক্ষত্রের অবস্থানের চিত্র দেখতাম এবং চিৎ হ'য়ে শুয়ে আকাশের গায়ে সেগুলি মিলিয়ে নিতাম। এইভাবে সৌরমণ্ডল সম্বন্ধে আমার সত্যিই বেশ জ্ঞান অর্জ্জন হ'য়ে গেল।

থাকাখাওয়ার পরিবর্ত্তে খাটতে গিয়ে আমার পড়াশোনার ক্ষতি হ'তে লাগল, তখন নিজেই অন্যত্র থাকবার চেষ্টা করতে লাগলাম। শরৎকালে আলু উঠলে কয়েক বস্তা আলু নিয়ে আসতাম এবং প্রতি রবিবার

সাত মাইল হেঁটে বাড়ী গিয়ে এক থলে পাঁউরুটী নিয়ে আসতাম। তখন 'ক্যালরি' এবং 'ভিটামিন' কাকে বলে তাই কেউ জানত না, কিন্তু আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম যে, দিনের পর দিন একটি বাড়ন্ত ছেলের পক্ষে কেবল পাঁউরুটী আর আলুটাই যথেষ্ট নয়—অন্ততঃ এখন ত' সে কথা বুঝতেই পারছি।

তখনকার সেই স্কুলে চার বছর—এখনকার কলেজের প্রথম দু'বছরের সমান। কলেজের ছাত্রদের চেয়ে ভাষা ভাল ক'রেই শেখান হ'ত (তিন বছর ধ'রে ইংরিজী ব্যাকরণ ইত্যাদি শিখতে হ'ত, কারণ আমাদের শিক্ষক ছিলেন কানাডাবাসী এবং তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিল ইংরিজী শেখা খুব ভাল)। অঙ্কে ক্যালকুলাস পর্য্যন্ত, এবং জার্মান ব্যাকরণ পড়তে হ'ত। তা ছাড়া ওয়ালেনস্টাইন এবং ঐ ধরণের লেখকদের লেখা পড়বার পণ্ডশ্রমও করতে হ'ত। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যা যা দরকার সেইগুলো ছাড়া বাকী সবই। কবিতা নাটক আমি মোটেই বুঝতে পারতাম না, এমন কি ইংরিজী কবিতা নাটকও—আর জার্মান ভাষা ত' ছিল আতঙ্কবিশেষ।

ওই চার বছরে অনেক খুঁটিনাটি জিনিষ শিখলাম বটে কিন্তু আমার শিক্ষার খানিকটা ক্ষতি হ'ল। জ্ঞানবৃদ্ধির মতন পাঁচজনের সঙ্গে পরিচিত হওয়াটাও ঠিক তেমনিই দরকারী। আমার বেয়াড়া ছাঁট-কাটের জামাকাপড় এবং আদব কায়দার অভাবে সমাজে বড় একটা কারও সঙ্গে মিশতে পারতাম না—অন্ততঃ আমার ত' তাই মনে হ'ত। একটু যারা ভদ্র তারা তাদের বাড়ীর দরজা অবধি বেশ ভদ্র ব্যবহার করত—কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করতে দিত না। আমি একবার চেষ্টা ক'রেছিলাম রুসি নামে একটি ছোট মেয়েকে কয়েক মাইল দূরের গ্রামে কুয়ো খোঁড়া দেখতে নিয়ে যেতে। কিন্তু তার মা একবার অপাঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে ব'লেছিলেন "আ মর্"—।

ঐ অভিজ্ঞতাটি সত্যিই মর্ম্মন্তুদ। এখন অবশ্য মনে হয়—এ হয়ত অনেকটাই আমার কল্পনার সৃষ্টি, অনেক বছরের সঞ্চিত হীনমন্যতারই ফল।

উনিশ বছর বয়সে সেই বিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট হলাম। সেই সময়কার দু'টি ঘটনা আমার বেশ মনে আছে। গ্র্যাজুয়েটদের প্রত্যেককে একটি ক'রে আদর্শ নির্ব্বাচন করতে হ'ত। আমি নির্ব্বাচন ক'রেছিলাম "আহারের সময় কখনও দেরী করব না"। অন্য কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামাল বলে মনে হ'ল না কিন্তু আমি সারাজীবন ঐ নীতিই মেনে এসেছি। অন্য অনেকে বড় বড় আদর্শ বাক্য ব'লেছে, কিন্তু আমার নীতিটিই সব চেয়ে বড়। আর একটি ঘটনা ছিল পোষাক সংক্রান্ত। আমাদের বিশেষ ধরণের কাটা একটা কোট পরতে হ'ত। আমার দীর্ঘতার জন্যে কোটটি কোনও রকমে কোমরের নীচে অবধি পৌছল। এই কোটটির দাম নিয়েছিল ১২ ডলার—আমাকে স্রেফ ঠকিয়েছিল। যদিও এই অদ্ভুত কোট সত্যিই হাস্যকর ছিল (ক্লাউনের চেয়েও) তবুও কেউই হাসে নি।

আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল—"ভবিষ্যতে কি হবে?" অধ্যক্ষ আমার জীবনসংগ্রামের কথা জানতেন এবং আমাকে খুব ভালবাসতেন। তিনি আমার অঙ্কে ব্যুৎপত্তির এবং অন্যান্য অনেক কথাও বললেন যার সবিশেষ বুঝলাম না। কি জানি কেন উপস্থিত সকলেই তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হ'য়ে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানাতে এল—সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পঞ্চাশ বছর আগে একটি গাঁয়ের ছেলের ডাক্তার হওয়ার উচ্চাকাঙ্খা যে কি জিনিষ তা আজকে অনুমান করাও কঠিন। তখন আমাদের সমাজের সমঝদার লোকেদের বিশ্বাস ছিল যে, সমগ্র উকীলজাতি এবং বেশীর ভাগ ডাক্তারই নরকে যায়। যে ক'টি ডাক্তার অবশিষ্ট থাকে, তারা হ'চ্ছে দাড়িওয়ালা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। বেশীর ভাগ ডাক্তাররাই তখন মদ্যপান ও ধূমপান করত এবং ধর্ম্মের ধার ধারত না। আমি বেশ জানতাম যে, আমার ডাক্তার হওয়ার আকাঙ্খার কথা তুললেই এক বিরাট প্রতিবাদের ঝড় উঠবে।

আমি মোটেই ভাবতাম না ডাক্তারী শিখে আমি কি করতে পারব। এখনও আমার সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমার যখন চার বছর বয়স আমি তখন থেকেই শিশি বোতল নিয়ে খেলা করতাম এবং আমার মাকে ডাক্তার দেখতে এলেই বেশ মনোযোগ দিয়ে তাঁদের কার্য্যকলাপ পর্যাবেক্ষণ করতাম। আমি যে কেন ডাক্তার হ'তে চেয়েছিলাম তা আমার অন্যান্য অনেক খেয়ালের মত আজও দুর্বোধ্য। বংশে কেউ কখনও ডাক্তার ছিল না; পরিবারের কেউ চাষী, আর কেউ বা মিস্ত্রী, কেউ কেউ হয়ত রবিবারে ধর্ম্মকথা প্রচার ক'রেও বেড়াতেন। সে যাই হোক, আর যে কারণই থাক আমার ডাক্তারী করা ছাড়া অন্য কোনও চিন্তা কখনও মাথায় আসে নি।

বেশীর ভাগ ডাক্তারদেরই ওষুধের দোকান বা ডিস্পেন্সারী ছিল, তারা ঝাঁকড়া গোঁফ রাখত এবং রোগী দেখত। রোগী দেখত মানে—রোগীর জিভ দেখত—যদি একটা ঘড়ি থাকত ত' নাড়ীও পরীক্ষা করত এবং তাক্ থেকে একটা তৈরী ওষুধ দিয়ে দিত। যেমন, আমি যখন

ছোট ছিলাম—আমার প্রায়ই পিঠে বেদনা হ'ত এবং তলপেট অবধি বেদনা বিস্তার করত। আমার বাবা এই রকম এক ওষুধের দোকানে এক ডাক্তারের কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার ইতিবৃত্ত শুনে তার লম্বা শাদা দাড়ীতে হাত বোলালেন কয়েকবার, একবার চশমার ফাঁক দিয়ে আমায় দেখলেন, তারপর বাবার দিকে চেয়ে বললেন, "ব্যাপারটা হ'চ্ছে ওর একটু বাড়ন্ত গড়ন কিনা—তাড়াতাড়ি শরীরটা বেড়ে উঠছে তাই।" তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠার কথাটা অবশ্য সত্যিই ডাক্তারের যুক্তির সঙ্গে মেলে, কিন্তু আসলে ডাক্তারী অভিমতটি বাজে, কারণ কয়েকমাস বাদে দেখা গেল আমার তলপেটে পাথুরী হ'য়েছে।

তখনকার বেশীর ভাগ ডাক্তার কোনও কালে স্কুলে ডাক্তারী পড়েন নি। অনেকেই কেবলমাত্র একটা ডাক্তারী বই কিনেই ডাক্তার হ'য়ে যেতেন। অবশ্য সবাই তা ছিলেন না: আমাদের সহরে একজন ডাক্তার ছিলেন যিনি স্কুলে ডাক্তারী পড়েছিলেন—মানে কিওকাক মেডিক্যাল কলেজে বছরে পাঁচমাস ক'রে দু'বছরে মোট দশমাস পড়েছিলেন। ভদ্র-লোকের ভাল ডাক্তার হিসেবে সুনাম ছিল কিন্তু কদাচিৎ তাঁকে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় পাওয়া যেত অর্থাৎ ভদ্রলোকের পানদোষ ছিল। তখনকার লোকেদের ধারণাই ছিল যে, মাতাল ডাক্তাররা প্রকৃতিস্থ থাকলে খুব ভাল ডাক্তারী করতে পারতেন। ডাক্তারটির সম্বন্ধে আমাদের এই ধারণা কি ক'রে যে হ'ল ভগবানই জানেন—কারণ সেই ডাক্তারকে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় কখনও দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। তাঁর একটি ডাক্তারীর ঘর ছিল। আমার তখন ভয়ানক সখ ছিল লেখাপড়া জানা ডাক্তার, যার ওষুধের দোকান নেই অথচ ডাক্তারীর ঘর আছে, তাঁর সেই ডাক্তারী ঘরের ভিতরটা দেখবার। আসলে ঘরের মধ্যে তিনি মদ চোলাই করতেন। ঘরের ভিতরটা দেখার আশা ছিল না বললেই হয়;

কারণ আমাদের বাড়ীর ডাক্তার দরকার হ'লে ওষুধের দোকানওয়ালা এবং ঝাঁকড়াগুঁফো হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের কাছেই খালি যাওয়া হ'ত।

হঠাৎ আমার মাথায় একদিন একটি বুদ্ধি খেলল। সাহস ক'রে তার অফিসের ভিতরে ঢুকে গেলাম দাঁত তোলাবার অছিলায়। আসলে আমার সব ক'টি দাঁতই খুব ভাল ছিল কিন্তু ডাক্তারের ঘরের ভিতরে কি আছে জানতে দাঁত খোয়াতেও আমার আপত্তি ছিল না। তখন সেই অফিসের দরজা খুলতে আমার যা সাহসের দরকার হয়েছিল পরে কোনও ডাক্তারী চিকিৎসার ব্যাপারেও অতটা সাহস দেখাবার প্রয়োজন হয় নি। দরজা ঠেলে ত ভিতরে ঢুকলাম। ডাক্তার একটা চেয়ারে আধঘুম অবস্থায় ঝিমোচ্ছিলেন। আমার হাঁটুর ঠক্‌ঠকানীর আওয়াজে না কিসে যে তিনি জেগে উঠলেন ঈশ্বরই জানেন। যাই হোক তিনি বললেন, "তোর আবার কি চাইরে ছোঁড়া?" অতিকষ্টে বললাম, "দাঁত তোলাব"। তিনি টেবিলের উপর একগাদা নোংরা যন্ত্রপাতির ওপর থেকে একটা সাঁড়াশী তুলে আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, "বোস্—কোন্‌টা?" আমি উপরের পাটীর সামনের দাতটাই দেখিয়ে দিলাম—সেইটাই সবচেয়ে হাতের গোড়ায় ছিল ব'লে। তিনি এক ঝট্‌কা টান দিলেন! ব্যস্ দাঁতটি বেরিয়ে এল। "গামলায় থুথু ফেল্" বলে তিনি আবার চেয়ারে ঘুমোবার উপক্রম করলেন। রক্ত থামতে অনেকক্ষণ সময় লাগল এবং ততক্ষণে আমি ঘরের যাবতীয় জিনিষপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিলাম। একটি তাকে আটটি বই ছিল, পাঁচটা বড় বড় এবং তিনটে ছোট ছোট—এতগুলো বই যে থাকতে পারে তা আমি ধারণাই করিনি। একটি পুরণো কাউচ, তিনটি সাধারণ চেয়ার, একটি ছোট টেবিল, তার উপর বিস্তর যন্ত্রপাতি—ভীষণ নোংরা—আমার দাঁততোলা সাঁড়াশীটাও ওর মধ্যে ছিল, আর নিজে যে চেয়ারে বসেছিল সেইটা এবং একটা ডেস্ক। এই ছিল মোটামুটী আসবাবপত্র।

এই সব দৃশ্য দেখেও কেন যে ডাক্তারী পড়ার সাধ মেটে নি তা ঠিক বলতে পারি না। কারণ বোধ হয় তিনি রোগীদের জন্তেই বেঁচে থাকতেন। বরফ এবং কাদার সঙ্গে লড়াই ক'রে ক্লান্ত হ'লে একটু হুইস্কি পান ক'রে শক্তি সঞ্চয় ক'রে নিতেন। আবার যখন আবহাওয়া ভাল থাকত তখন বরফ আর কাদা আবার হ'তে পারে এই ভেবে খানিকটা হুইস্কি পান করতেন। দিনের পর দিন বছরের পর বছর, এইভাবে চলত। একদিন তাঁর গাড়ীর ঘোড়াদুটো অন্ধকার রাত্রে গাড়ী শুদ্ধ এক খানায় নিয়ে গিয়ে ফেললে। তারপর নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হ'য়ে ভদ্রলোক মারা গেলেন। পোস্ট অফিসের আড্ডায় অবশ্য সবাই বলাবলি করল—"আহা ডাক্তারটা প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ভাল ডাক্তার ছিল" ইত্যাদি।

তাঁকে একটা বাক্সে পুরে গাঁয়ের গীর্জ্জায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। পাদ্রী মশাই মিতাচারের গুণাবলী সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। তারপর তাঁকে গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তাঁর বন্ধুরা হাস্যজনক অঙ্গভঙ্গী করল; তারপর তাঁকে মাটিচাপা দেওয়া হ'ল। অনেক রোগীকে তিনি যেখানে পাঠিয়েছেন সেখানে তিনি নিজেও গেলেন। অনেকেই যারা কোনও কালেই তাঁর কাছে যায় নি—তারাও কিছু কিছু চাঁদা দিয়ে কবরের খরচা তুলে দিল। তবুও একটা কথা স্বীকার করতে হবে যে—এই ডাক্তার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা জিনিষ চলে গেল সেটা হ'চ্ছে নিঃস্বার্থ পরোপকার প্রবৃত্তি। ভদ্রলোক কোনও রকম পয়সার আশা না করেই চিকিৎসা করতেন। ভাল ডাক্তার হন বা না হন, ছেলেরা ওঁর কাছে আসতে ভালবাসত। আর উনিও জানতেন, যে কোনও অবস্থাতেই ছেলেপুলেদের ভালবাসাই হ'চ্ছে নিরাপদ। আরও একটা জিনিষের জন্তে তাঁকে খুব বীর বলে আমার মনে হ'ত। তিনি জল কাদা বা ভূতাপ্রেত ইত্যাদিকে কোন কালেই ভয়ডর করতেন না।

সে যাই হোক, আমি ডাক্তারী পড়ব-ই দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলাম। তখন ডাক্তারী স্কুলে ঢোকবার আগে কোনও ডাক্তারের কাছে কিছুদিন শিক্ষানবিশী করতে হ'ত। অর্থাৎ তার ঘোড়ার গাড়ী চালাতে হ'ত, অফিস সাফ করতে হ'ত, আর মোটের উপর তাঁর দারোয়ান এবং নার্সের কাজও করতে হ'ত। সেই সময়ের বেশ একটা মজার ব্যাপার আমার মনে আছে। ঐ সহরের আর একটা ছেলেও এক ডাক্তারের কাছে তখন শিক্ষানবিশী সুরু ক'রেছে। ডাক্তারের কাছে তিন সপ্তাহ শিক্ষানবিশীর পরই একদিন এসে বললে, "দূর! রোজ রাত্রে উঠতে হবে জানলে আমি ডাক্তারী শিখতে আসতুম না।" অর্থাৎ ব্যাপার বুঝতেই পারছেন।

এর পরিবর্ত্তে ডাক্তার সেই শিক্ষানবিশটিকে একটু বইটই ঘাঁটতে দিতেন। জামা কাপড়ের বাইরে শরীরের যে সব অংশ আছে সেখানে কোনও অসুখ বিসুখ হ'লে শিক্ষানবিশেরা দেখতে পেত—না হ'লে নয়। আমি একবার এক আশী বছরের বৃদ্ধের পায়ে এক দুষ্টক্ষত দেখেছিলাম। কোনও কোনও ডাক্তার ছাত্রদের পড়াতেও সাহায্য করতেন। এই শিক্ষকের সঙ্গে থেকে কাজ শেখার যথেষ্ট দাম ছিল—অবশ্য শিক্ষক এবং ছাত্র দুজনের উপরেই সেটা নির্ভর করত। আমার শিক্ষক আমাকে 'গ্রে'-র অ্যানাটমি বই থেকে রোজ দশপাতা ক'রে মুখস্থ ধ'রতেন।

এই সময়ই আমি প্রথম রোগনির্ণয় করার সুযোগ পাই। এক ছিয়াত্তর বৎসর বয়স্ক ভদ্রলোক সিঁড়ি থেকে পড়ে যান এবং ফলে তাঁর কোমরের হাড় স্থানচ্যুত হয়েছে ব'লে খবর পেলাম। আমার শিক্ষক তাঁর এক ডাক্তার বন্ধুকে নিয়ে ঘটনাস্থলে গেলেন। আমাকেও সঙ্গে যেতে বলা হয়েছিল। কড়িকাঠ সংলগ্ন একটি কাষ্ঠখণ্ডের সঙ্গে একটি কপিকল আটকে রাখা হয়েছিল এবং আর একটি কপিকল ছিল

মাটিতে। এই দু'টির সঙ্গে একটি দড়ি লাগান ছিল। কপিকল দু'টির মধ্যে মেঝের উপর রোগীকে একটি খড়ের বিছানায় শুইয়ে রাখা হ'য়েছিল। আমি লক্ষ্য করলাম যে রোগীর আহত পা-টি অপর পায়ের চেয়ে প্রায় ইঞ্চি চারেক ছোট এবং রোগীর পায়ের পাতাটি বেয়াড়াভাবে বাইরের দিকে বেঁকে আছে। আমি আমার শিক্ষকের কাছে গিয়ে চুপিচুপি বললাম, "ভদ্রলোকের পা-টা ঠিক আপনার বইএর ছবির মতন দেখতে লাগছে; আমার মনে হয় ওর উরুর হাড় ভেঙ্গে গেছে।" কারণ বইয়েতে ঐ ছবির নীচে লেখা ছিল 'উর্ব্বাস্থিভঙ্গ'। আমার শিক্ষক তাঁর ডাক্তার বন্ধুকে নিয়ে একবার বাইরে গিয়ে কি পরামর্শ করলেন। তারপর ঘরে ফিরে এসে তাঁরা আবার রোগীর পা'টা পরীক্ষা করলেন। সত্যিই উর্ব্বস্থি ভেঙ্গে গিয়েছিল। ভদ্রলোক সপ্তাহখানেকের মধ্যে মারা গেলেন যদিও। সহরে ফেরার পথে আমার মাষ্টারমশাই বললেন, 'তোর ডাক্তারীর চোখ আছে।" আমার মাষ্টার মশাই সত্যিই বেশ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন।

প্রথম বছর এই রকম শিক্ষানবিশী করার পর তারপর ছাত্রকে ডাক্তারী স্কুলে নেওয়া হ'ত। তারপর কোন্ স্কুলে পড়ব সেটা ঠিক করতে হয়। আমার ডাক্তার শিক্ষকের পরামর্শমত ঠিক করলাম আমি নর্থ ওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব। ওখানে ঢুকতে হ'লে বেশ লেখাপড়া জানার প্রয়োজন। অর্থাৎ উচ্চবিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা শেষ করা চাই। ওখানে বছরে সাতমাস ক'রে তিন বছর পড়তে হ'ত। তিন বছরে সহজ থেকে সুরু ক'রে ক্রমশঃ শক্ত জিনিষ পড়তে হ'ত। অবশ্য আজকাল সব জায়গাতেই তাই করে— কিন্তু আমাদের ডীন্ ডাক্তার ডেভিসের মাথাতেই এটা সর্ব্ব প্রথম আসে আর তিনিই এটা প্রথম চালু করেছিলেন নর্থ ওয়েষ্টার্ণ স্কুলে। যে সকল বিষয় আমাদের পড়তে হ'ত, তার একটা ঐতিহাসিক মূল্য

রয়েছে। এখনকার ছাত্ররা সেগুলোর সঙ্গে নিজের নিজের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে দেখলে বেশ আনন্দই পাবে সন্দেহ নেই।

রসায়ন ছাড়া অন্য বিষয় শিখতে হ'ত সত্যিকারের ডাক্তারের কাছে। স্কুলে সত্যিকার এবং সারাক্ষণের লোক বলতে জন দুই থাকত—রসায়নের শিক্ষক এবং দারোয়ান। সুতরাং বিজ্ঞানের বিষয় খুব কমই শেখান হ'ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হিষ্টোপ্যাথলজির যে শ্লাইডগুলি দারোয়ান আমাদের জন্যে তৈরী করতো, গভীরতা ও স্বচ্ছতার দিক থেকে রেস্তোরাঁর গোমাংসের টুকরোর সঙ্গে সেগুলির তুলনা করা যায়। এর একটা সুবিধে ছিল এই যে, ছাত্ররা এ থেকে এমন কিছু দেখতে পেত না যাতে তারা প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ক'রে শিক্ষককে বিব্রত ক'রে দিতে পারে। গোল কোষযুক্ত 'সার-কোমা'র শ্লাইডগুলির কথা আমার বেশ মনে আছে। এটির আকৃতি ছিল টেক্সাস রাজ্যের মত। এর একটি কোষও চেনবার উপায় ছিল না। আমি সব সময় আকৃতি থেকেই এগুলিকে চিনতাম আর পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেতাম।

রসায়ন শেখাতেন দুর্দ্ধর্ষ জন হারপার লব্‌। আমরা তাঁকে বলতাম "জনি হাইড্রোজেন।" রসায়নে গোড়ায় কিছু পড়াশোনা ছিল না ব'লে আমাদের প্রায় সকলেরই কিছু কিছু অসুবিধে হ'ত। কিন্তু আমাদের অধ্যাপক সে সম্বন্ধে গ্রাহ্যই করতেন না। তাঁর খালি চেষ্টা কি ক'রে ফাঁকি দেবেন। সে সম্বন্ধে তাঁর কৃতিত্বও ছিল অদ্ভুত।

শরীরতত্ত্ব বা এ্যানাটমি শেখাতেন ছোকরা ডাক্তাররা। 'গ্রে'-র এ্যানাটমিখানা প্রায় সবটা মুখস্ত করতে হ'য়েছিল—প্রায় মন্ত্রপড়ার মতন নির্ব্বিঘ্নে উচ্চারণ ক'রে যেতে পারতাম। ডাক্তারের কাছে শিক্ষানবিশী করবার সময় এটা আমার কিছু অভ্যাস করা থাকায় আমার এখন সুবিধেই হ'ল। তখন এবং এখনও দরকারী অদরকারী সম্বন্ধে

বিশেষ মাথাঘামানো হ'ত না—বইয়ে যা থাকত তাই শিখতে হ'ত। বইয়ে যেমন ট্রাইফেসিয়াল নার্ভে ৪৫টা শাখা আছে বলে—কিন্তু হাতে-কলমে শরীর ব্যবচ্ছেদ ক'রে মোটামুটি তিনটের বেশী পাই না—এবং আমি যদিও এককালে এ্যানাটমি পড়াতাম কিন্তু তিনটের বেশী আছে বলে গ্রাহ্যও করি না।

শরীর ব্যবচ্ছেদের কক্ষে কিন্তু আলাদা কথা। এখানে কেবলমাত্র সেইগুলি করতাম যেগুলি কার্য্যক্ষেত্রে দরকার হবে। ছোকরা ডাক্তাররা জানতেন ঠিক কি কি জিনিষ দরকার এবং সেইগুলোর উপর জোর দিয়ে পড়াতেন। আমরা শ্বাসনালীর গঠন ও অবস্থানের বিষয় এমনভাবে শিখেছিলাম যে, ডিপথিরিয়ার জন্যে খুব তাড়াতাড়ি শ্বাসনালীতে অস্ত্রোপচারের দরকার হ'লে বই দেখার দরকার হ'ত না।

কৌতূহলের বশে বহু ধরনের লোকই আমাদের দেহ ব্যবচ্ছেদের ঘরে আসত। এ অঞ্চলের পুলিশ প্রায়ই রোঁদে বেরিয়ে আমাদের এই ঘরে ঢুকে পড়ত। বিপুল অভিনন্দন দেওয়া হত তাকে—কারণ প্রায়ই তাকে ক্লাসের মারামারি থামাবার জন্যে ডাকা হ'ত সুতরাং আমরা তাকে সম্মান দেখাতে উৎসুক ছিলাম। একদিন ধর্ম্মশিক্ষার ক্লাসের অনেক ছেলে এল। তাদের কাছে ডাক্তারী ছাত্ররা ছিল গুণ্ডাবদ্‌মাইসের দল। তারা সকলেই প্রিন্স এলবার্ট কোট পরত আর তাদের অনেকেই চাঁদা পেত।

হাতেকলমে শিক্ষা পেতাম সহরের সবচেয়ে ভাল পশারে ডাক্তারদের কাছে। বক্তৃতা দিয়েই সাধারণতঃ পড়ান হ'ত। তার পরই নানারকম প্রশ্ন করা হ'ত ছাত্রদের। ছাত্ররা এই সব বক্তৃতা লিখে নিত, তারপর তা মুখস্ত ক'রে ফেলত। আমরা প্রায় জনদশেক মিলে এক একটা দল গ'ড়ে নিজেরা নিজেদের প্রশ্ন ক'রে নিজেরাই জবাব দিতাম। আবার দলেদলেও সেরকম বন্দোবস্ত হ'ত। এর ফলে আমরা কয়েকটা বিষয়

বেশ ভালভাবেই শিখে গেলাম। আমার সেই পুরণো সব 'নোট্' এখনও আছে। এখনও আমি বিশেষ পড়াশুনো না করেই পরীক্ষায় পাশ ক'রে যেতে পারি। অর্থাৎ, আমি তখন পাশ করার সময় যা জানতাম এখনও প্রায় তেমনি জানি—অন্ততঃ অনেক ডাক্তার তা জোর ক'রে বলতে পারে না।

মোটা মোটা বই পড়ার চেয়ে বক্তৃতা শুনে শেখার দাম অনেক বেশী, কারণ সে ক্ষেত্রে শিক্ষক বক্তৃতাকালে দরকারী বিষয়গুলি জোর দিয়ে বোঝাতে পারেন। সৌভাগ্যক্রমে শিক্ষক ছিলেন বেশী নয়—জন ষোল; এখন যেখানে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে প্রায় চারশ'। শুনলে হঠাৎ চমকে উঠতে হয়। এর আসল কারণ হচ্ছে এখন ছোট ছোট দলকে এক একজন শিক্ষক পড়ান কিন্তু আমাদের সময় একটা বিরাট ক্লাসেই একজন শিক্ষক বক্তৃতা দিতেন। তাছাড়া এখন শেখবার বিষয়বস্তুও অনেক বেশী হ'য়ে গেছে। বিশেষ ক'রে ল্যাবরেটরীতে। যেমন আমাদের সময় জীবাণু সবে আবিষ্কৃত হ'য়েছে এবং সে সম্বন্ধে দু'একটা ক্লাস করলেই হ'ত আর তা নিয়ে ল্যাবরেটরী ক্লাস করার কোনও বালাই ছিল না।

ডাক্তারী ক্লাসে বক্তৃতার প্রথা উঠে যাওয়ার আরও একটি কারণ হ'চ্ছে, আজকাল আগের মতন বক্তাও বিশেষ পাওয়া যায় না—যাঁরা গবেষণার কাজ করেন তাঁরা ভাল বলিয়ে কইয়ে হন না। বেশীর ভাগ গবেষণার ছাত্রই চশমা পরেন সেটাও আর একটা কারণ বোধ হয়। খুব জোর বক্তৃতার সময় বাঁধানো দাঁতের মত চশমারও ঠিকরে পড়ার সম্ভাবনা আছে। চশমা পরা বক্তার কথা ভাবতেও পারা যায় না। তা ছাড়া যাঁরা খুব চুলচেরা যুক্তির পক্ষপাতী তাঁরা বক্তা হ'লে প্রাণান্তকর হ'ন। কোনও রকম অবজ্ঞাভরে একথা বলছি না। ভাল বক্তার পক্ষে মোটামুটী ঘটনা পেলেই হ'ল, খুঁটিনাটি ঘটনা

জানার কোনও প্রয়োজন হয় না। আমাদের রাজনৈতিক বক্তাদের মধ্যে তার প্রমাণ আছে—অথচ গবেষণাকারীদের প্রত্যেকটি প্রমাণকে চুলচেরা যুক্তি দিয়ে বিচার করতে হ'বে। ডাক্তারী গবেষকদের আমি হেয় করছি না কিন্তু তাঁদের দ্বারা ছাত্রদের কোনও উপকার হয় না। এটা মনে রাখতে হবে যে, সাধারণ ডাক্তার প্রায়ই বুঝতেই পারে না যে গবেষণাকারী কি করছে। আমরা ডাক্তাররা যেন বিজ্ঞান-সম্মত প্রসবাগারের তীব্র যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাই এবং নার্স নবজাত শিশুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবার পর যেন আমাদের হাতে শিশুকে তুলে দেয়।

একটি ভাল শিক্ষকের কয়েকটি বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন। আমাদের দু'জন শিক্ষকের এই গুণ ছিল।

ধাত্রীবিদ্যার শিক্ষক জ্যাগার্ড খুব ধীরে ধীরে বলতেন। তা'তে ক'রে একটু তাড়াতাড়ি লিখিয়ে ছেলে প্রায় সব কথাই লিখেও নিতে পারত। তার নোট মুখস্থ করতে হ'ত। মুখস্থ মানে প্রত্যেকটি কথা। তাঁর আগেকার বক্তৃতাও মনে রাখতে হ'ত কারণ যখন তখন হয়ত অনেক মাস আগের দেওয়া নোট সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে বসতেন। আর যার তৈরী না থাকত···হায় বেচারা! তিনি তাকে ক্ষমা করতেন না।

নিজের পেশার দায়িত্ব সম্পর্কে খুব সজাগ থেকেই কথায় এবং কাজে ভবিষ্যতের দায়িত্বের কথা আমাদের মনে বেশ গেঁথে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল জ্যাগার্ডের। তিনি বলতেন, "আগেই ভাববে যে চিকিৎসা করতে যাচ্ছ তাতে কি ক্ষতি হ'তে পারে", "রোগী যা যা বলেছে রোগ সম্বন্ধে সেটাকে অত্যন্ত দরকারী ব'লে মনে রাখবে।" তিনি ছাত্রদের সামনে টেবিলের উপর একটি পেন্সিল রেখে উদাহরণ দিয়ে বলতেন, "এই একটা পেন্সিল" তার পাশে আর একটা পেন্সিল রেখে বলতেন "এই

আর একটা—রোগীও জানে দুটো হ'ল।" আবার তার পাশে আর একটা পেন্সিল রেখে বললেন, "এইবার তোমার স্ত্রীকে বল দেখি কটা পেন্সিল? কজন বলতে পারে?" পাশাপাশি তিনটে পেন্সিল দেখে ছেলেরা ব'লে উঠতো "তিনটে" তিনি চেঁচিয়ে উঠতেন, "না" একশ এগারো" এই ভাবে তিনি উদাহরণ দিয়ে আমাদের বোঝাতেন।

আর একজন উল্লেখযোগ্য শিক্ষক ছিলেন ফেঙ্গার। তাঁর বাড়ী ছিল ডেনমার্কে। তিনি ভাল ইংরিজী বলতে পারতেন না। এই কারণে তাঁর বক্তৃতা ভাল বুঝতে পারতাম না—কিন্তু শিক্ষক হিসেবে তিনি ভালই ছিলেন। তার কারণ ছিল তিনি অস্ত্রোপচারে ছিলেন অদ্ভুত পারদর্শী। তিনি প্রায়ই বলতেন যে, অস্ত্রোপচার শেখার একমাত্র উপায় হ'চ্ছে অস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ল্যাবরেটরীতেও সেই জিনিষগুলি অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা। তাঁর আরও একটি বৈশিষ্ট্য, তিনি প্রত্যেকটি জিনিষ নিখুঁত ভাবে করতেন। আমার মনে আছে তিনি একবার একটা টিউমারের বারোটা বিভিন্ন অংশ থেকে টিস্যু নিয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এই টিউমারে কি আছে আমরা জানি?" একটি ছেলে স্বভাবতঃই জবাব দিলে "হ্যাঁ"—তিনি বললেন, "না ঐ বারোটা জায়গায় কি আছে সেইটুকুই মাত্র জানি।" ডাক্তাররা যদি শুধু মনে রাখেন যে, রোগ নির্ণয়ের জন্যে তাঁরা যে স্লাইডটি পরীক্ষা করেন, তা থেকে দেহের ক্ষুদ্র একটি স্থানেরই পরিচয় পাওয়া যায়, তাহ'লে অনেক ভুল ধারণা এবং ভুল লেখা বন্ধ হবে।

ফেঙ্গার বলতেন যে, অস্ত্রোপচার ক'রে বার ক'রে আনা প্রত্যেকটি টিস্যুকে পরীক্ষা করতে হবে অণুবীক্ষণে। একদিন ঘাড়ের লিম্ফ্‌ গ্ল্যাণ্ডের যক্ষ্মা অস্ত্রোপচার করতে হ'ল। একই জিনিষ দিনের পর দিন পরীক্ষা ক'রে হয়রাণ হ'য়ে উঠেছিল সহকারীটি এবং পরীক্ষার নমুনা-গুলি ফেলে দিয়েছিল। পরের সপ্তাহে ডাক্তার ফেঙ্গার সেই স্লাইডগুলি

দেখতে চাইলেন। সহকারী বলল এখনও সেগুলি তৈরী হয় নি। সে ভেবেছিল, অধ্যাপক নিশ্চয়ই কয়েকদিন বাদে ভুলে যাবেন ওর কথা। মোটেই না। পরের সপ্তাহে সহকারীকে দেখে প্রথম কথাই বললেন, "স্লাইডগুলি কোথায়?" সহকারীটি দেখল এ ভুলে যাবার আশা করা বৃথা, সুতরাং স্বীকার করল যে সেটি সে ফেলে দিয়েছে। ডাক্তার ফেঙ্গার হাত থেকে যন্ত্রের ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দাঁড়ালেন—তাঁর মুখ রাগে বেগুনে হ'য়ে গেল—চেঁচিয়ে উঠলেন, "ফেলেই যদি দাও তাহ'লে শিখবে কি ক'রে?"

তাঁর কয়েকটা বেয়াড়া ব্যবহার সত্ত্বেও আমি অধ্যাপক ফেঙ্গারকে আমার একজন বিশিষ্ট শিক্ষক ব'লে মনে করি। তাঁর অক্ষুণ্ণ প্রভাব তাঁকে বিশিষ্ট শিক্ষক ক'রেছিল। "নিরলসভাবে কাজ ক'রে যাও, অস্ত্রোপচার কক্ষ থেকে যাও ল্যাবরেটরীতে আবার ফিরে এস অস্ত্রোপচার কক্ষে, এই দুয়ের মধ্যে থেকে অনুসন্ধান ক'রে যাও"—এই ছিল তাঁর মূলনীতি এবং নিজেও তাই কাজে ক'রে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

সার্জিক্যাল প্যাথলজি হ'চ্ছে রোগটা আরম্ভ হওয়ার বা তারও আগে থেকে তার অনুসন্ধান এবং কি ক'রে রোগ বেড়েছে সেটা জানা। মানুষেই এর সুরু এবং মানুষেই এর শেষ। লোকটি কেন মরল? আরও আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি হ'লে আমরা রোগ আরও আগে ধরতে পারব এবং রোগের ক্ষতিটাও ছুরীর সাহায্যে আরও আগেই আবিষ্কার করতে পারব। সেই হ'চ্ছে সত্যিকারের সার্জিক্যাল প্যাথলজির উদ্দেশ্য।

আমরা ঠিক এখনকার ছাত্রদের মতই খাটতাম। এখনকার ছাত্রদের কৌতূহল হয় জানতে যে, তখন ডাক্তারীশাস্ত্রে মাত্র ওই কটা জিনিষ আবিষ্কৃত হ'য়েছিল—আমরা তা নিয়ে কি এমন করতাম? সত্যিকারের রোগী দেখা সম্পর্কীয় জিনিষ নিয়েই তখন আমরা ব্যস্ত থাকতাম। একটা বিশেষ কোনও রোগের লক্ষণ বা গতিবিধি যদি

ভাল ক'রে মনে রাখা যেত তাহ'লে পরে এই রোগ দেখলেই সে চিনতে পারবে—সে বইয়ে প'ড়েই থাক আর নাই থাক। আমার বেশ মনে প'ড়ে এ্যাপেণ্ডিসাইটিস বা গল্‌ষ্টোন্ রোগ প্রথম দর্শনে চিনতে কোন কষ্টই হয় নি, যদিও বইয়ের বিদ্যা ছাড়া আর কোনও জ্ঞানই ছিল না ও সম্বন্ধে।

সবচেয়ে দরকারী কথা হ'চ্ছে, আমরা একটা জিনিষ ভাল ক'রেই শিখেছিলাম তা হ'চ্ছে রোগের উপসর্গকে দমিয়ে রাখা, যাতে ক'রে রোগীর কিছুটা আরাম হ'ত যতক্ষণ না রোগটা ধরতে পারি ; কিংবা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হ'ত কি রোগটা আপনা থেকেই সেরে যেত। এটা অবশ্য এখনও চলে। ধ'রে নেওয়া যাক ডাক্তারের প্রধান কর্ত্তব্যই হ'চ্ছে জীবন রক্ষা করা, কিন্তু তা' সে করে কেবল মাঝে মধ্যে। রোগী যেটা আগেই চায় তা হ'চ্ছে কষ্টের উপশম এবং এইটে যে-ডাক্তার ভাল জানে তার পশার ভাল জমে। রোগের লক্ষণের চিকিৎসা করা উচিৎ কাজ নয়—সেইজন্য সেটা স্কুলেও শেখান হয় না।

এখন যা হয় তা হ'চ্ছে রোগটা নির্দ্ধারণ করা হয় এবং হয় গুরুতর নয় সেরে যাবে মনে হ'লে নার্সের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এটা বিজ্ঞান-সম্মত হ'লেও কিছুটা নিষ্ঠুর না ব'লে পারা যায় না। কষ্টভোগ না ক'রেও রোগী তেমনি তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে, সুতরাং কোন্ ওষুধে তার কষ্ট কমবে জানি না ব'লেই কি তাকে কষ্টভোগ করান ঠিক? আমরা জানতাম কোন্ ওষুধে কোন্ বেদনা সারবে, কারণ আমরা অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি অমুক ওষুধে অমুক বেদনার উপশম হয় যদিও সে সম্বন্ধে কোনও বইই আমরা পড়ি নি। কিন্তু আজকাল যদি কোনও ওষুধ ল্যাবরেটরিতে পূর্ব্বপরীক্ষিত না হয় তাহ'লে ছোকরা ডাক্তাররা আর তা ব্যবহার করবে না। যেমন ধরা যাক, হাঁপানীওলা ব্যাঙে পটাসিয়াম অয়োডাইড কোনও কাজে লাগে না ব'লে মানুষের হাঁপানিতে

ওই ওষুধ দেওয়া বারণ, যদিও এটা বহুবার প্রমাণিত হ'য়েছে যে, বৃদ্ধদের হাঁপানিতে এটা ব্যবহার করলে রোগের উপশম হয়।

আমাদের সময়ের ছাত্ররা আর এখনকার ছাত্ররা স্কুল থেকে বেরুবার সময় কি শেখে দেখা যাক। আমরা ত' একই ধরনের মানুষ। এখন অবশ্য ছাত্ররা অনেক জিনিষের কিছু কিছু জানে যা আমাদের সময়ে ঘুণাক্ষরেও জানা ছিল না। কিন্তু সাধারণ রোগ সম্বন্ধে এখনকার ছাত্রদের চেয়েও আমরা অনেক বেশী জানতাম। আমরা ওষুধপত্রও ভাল জানতাম এবং তার ব্যবহারও ভাল বুঝতাম। কোন্‌টা ব্যবহার করলে রোগের উপশম হ'বে তা জানতাম—যদিও ব্যাঙের উপর সেই ওষুধের কার্যাকারিতা মোটেই জানতাম না।

আসল কথা হ'চ্ছে, ডাক্তারী শাস্ত্রটা বিজ্ঞান হ'লেও তার পশারটা হ'চ্ছে একটা অভ্যাসের জিনিষ। ডাক্তাররা কি ক'রে শেখে সে সম্বন্ধে আমরা কুকুরদের কাছে থেকে কিছুটা অনুমান করতে পারি। বাচ্ছা কুকুরটা গন্ধ শুঁকেই ধরতে পারে। তারপর দেখতে যায় গন্ধটা কি থেকে আসছে। গিয়ে দেখে ওহো এ ত একটা খরগোস। এই রকম বার কয় হ'লেই সে বুঝতে পারে যে ওই গন্ধ মানেই ধারে-কাছে কোথাও খরগোস আছে। সে আর গিয়ে দেখতে যায় না গন্ধটা কিসের। যাবার আগেই সে জানে যে খরগোস নিশ্চয় আছে। ওষুধ ব্যবহারও অনেকটা তেমনি। ডাক্তার পেটে হাত দিয়েই বুঝতে পারেন পেটের ভিতর জ্বালা আছে। কুকুরের মতন তাঁর জ্ঞানও ঠিক ঐভাবে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই এসেছে।

অবশ্য এই ধরনের হাস্যজনক বর্ণনা দিয়ে ব'লতে চাই না যে কোন্ অসুখটা গুরুতর আর কোন্‌টা গুরুতর নয় এটা ধরতে পারলেই ডাক্তার হ'য়ে যায়। বরং কষ্টের কারণ কি, কখন অপেক্ষা করতে হয়, কখনই বা ওষুধ দিতে হয় এটা জানা উচিৎ ডাক্তাদের।

আমাদের যোগ্যতা যাই থাক আমাদের পড়ার শেষে আমাদের ডিপ্লোমা দেওয়া হ'ত এবং আগ্রহশীল জনসাধারণ তা'তে ক'রে জানত যে ডাক্তারী করার যোগ্যতা আমাদের হয়েছে।

স্বীকার করা ভাল যে, শিক্ষকদের কাছে বিদ্যা যা শিখেছি তা যৎসামান্যই। কিন্তু আমরা তাঁদের কাছে একটা শিক্ষা পেয়েছি তা হচ্ছে কোনও কিছু করার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি এবং অক্লান্ত চেষ্টা করা। আমাকে যদি আবার জীবন সুরু করতে হয়, তাহ'লে আমি ওই শিক্ষকদের কাছেই পড়তে চাই। তাঁদের মধ্যে যদিও কোনও তুলনামূলক মাপকাঠি ছিল না কিন্তু প্রত্যেকেই নিজের নিজের অভিজ্ঞতায় এক একটি দিকে অসাধারণ ছিলেন। এখনও ব্যবসায়ের মান বেঁধে দেওয়া সত্বেও প্রত্যেক ডাক্তারই নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করেন। এই ব্যক্তিত্ব কার্যক্ষেত্রে তাঁর নিজের চেষ্টারই ফল। ডাক্তার যখন রোগীকে দেখেন, সেখানে তাঁর আপন ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন হয়। লোকচরিত্রের অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের মধ্যে এই ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গ্রাম্য অঞ্চলের চিকিৎসাকে সেই জন্যই বলা হ'ত 'গেঁয়ো চিকিৎসা'। রোগীরা গ্রামাঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করত। সেই জন্যে রোগী দেখতে হ'লে ডাক্তারদের সেই সকল জায়গায় গাড়ী হাঁকিয়ে যেতে হ'ত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ডাক্তারেরা গ্রামে বাস করতেন—কিন্তু কেবলমাত্র ঐ গ্রামের অধিবাসীরাই তাঁর রোগী নয়—তারা তাঁর

সমস্ত রোগীর অতি সামান্য একটি অংশ মাত্র। ডাক্তারবাবুদের চেম্বারের কাজ কমই থাকত, কেননা রোগ ক্রমশঃ খারাপের দিকে না যাওয়া পর্য্যন্ত বা রোগের যন্ত্রণা সহের সীমা ছাড়িয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত বাড়ীতেই রোগীদের এটা-ওটা সাধারণ ওষুধ দেওয়া হ'ত।

গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসার ধারা সেই জন্য দু' ভাগে বিভক্ত ছিল—প্রথমটি হচ্ছে গাড়ী হাঁকিয়ে রোগীর কাছে যাওয়া এবং রোগীর শয্যাপোর্শ্বে নিজেকে হাজির করা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে রোগীর শয্যাপার্শ্বে নিজেকে হাজির করার পর তাঁকে যা' যা' করতে হয় করা।

চিকিৎসা বৃত্তির সুরুতে রোগী দেখতে যাওয়ার যানবাহন নিম্নলিখিত ক্রম অনুসারে পছন্দ করা হত: একটি বা একাধিক ঘোড়াযুক্ত বগীগাড়ীতে; দু' চাকাবিশিষ্ট ঘোড়ার গাড়ীতে, এর উপর একটি সাধারণ এবং শক্ত কাঠ পাতা—যার উপর কোন গদিও আটকান যেত না; ঘোড়ার পিঠে এবং সব শেষে পায়ে হেঁটে বা নীচু ধরনের বাইসাইকেল চালিয়ে যাওয়া। যখন রাস্তা ভাল পাওয়া যেত এবং দূরত্বও অল্প হ'ত তখন সাইকেল চালিয়ে যেতে খুবই ভাল লাগত কিন্তু যখনই আমি সাইকেল চালিয়ে রোগী দেখতে গিয়েছি তখনই নিজেকে ছোট মনে হয়েছে। একটি বেশ লম্বা লোককে সাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময় কখনই চিকিৎসক বলে মনে হ'ত না।

স্বভাবতঃ বেশীর ভাগ রোগেরই প্রাদুর্ভাব হ'ত যখন খুব বেশী গরম বা খুব বেশী ঠাণ্ডা পড়ত বা প্রবল ঝড় বইত অথবা পথ এত খারাপ হ'ত যা বর্ণনা করা যায় না। সত্যি বলতে কি তখনকার দিনে কোন-ও রাস্তাই ছিল না—এই ধরনের ঋতুতে কখনও কখনও চব্বিশ ঘণ্টার বেশীর ভাগ সময়েই আমাকে বগীগাড়ীতে কাটাতে হ'ত। কখনও কখনও বসন্তে বা শরৎকালে যখন আবহাওয়া পরিষ্কার থাকত এক সপ্তাহ বা তার চাইতে বেশী সময়ের মধ্যেও মফঃস্বল থেকে

কোনও 'কল্' আসত না। রাস্তাঘাট যখন ভাল থাকত, তখন সমস্ত অধিবাসীরা যেন হঠাৎ এমন সবল সুস্থ হয়ে উঠত যে তা দেখলে বিরক্তি লাগত। কিন্তু ঐ সমস্তই আমাদের কাজের অংশ ব'লে আমরা মেনে নিয়েছিলাম। এই সূত্রে এই কথাটি লক্ষ্য ক'রে দেখতে বলি যে, এই ধরনের কষ্টকর ব্যাপারের জন্য অনেক তরুণ চিকিৎসকদের মফঃস্বল অঞ্চলে 'রোগী দেখা' থেকে নিবৃত্ত হ'তে হ'ত। পল্লীগ্রামে মানুষ ব'লে এই ধরনের কাযে আমি অভ্যস্ত ছিলাম এবং যা রোজগার হত তাতে নিয়মমত দু'বেলা খাওয়া জুটত বলে আমি খুবই সন্তুষ্ট ছিলাম এবং আগ্রহের সঙ্গেই আমি ঐ সর্ত্তগুলি স্বীকার করে নিয়েছিলাম।

সাধারণতঃ শীতকালে এবং ভাল রাস্তা পেলে দু'ঘোড়ার গাড়ীর পক্ষে ঘণ্টায় সাত মাইল বেগে চলা বেশ জোরে চলা বলেই গণ্য হ'ত। কর্দ্দমাক্ত রাস্তায় যখন ঘোড়ারা দৌড়নোর পরিবর্ত্তে হাঁটতে বাধ্য হত, তখন তারা গড়ে এক ঘণ্টায় তিন মাইল যেত। আর খচ্চরেরা যদি তাড়া না খেত তাহ'লে ঘণ্টায় আড়াই মাইল যেত—আর তাড়া খেলে গতি কমিয়ে আনত ঘণ্টায় দু' মাইলে, আবার অতিরিক্ত তাড়না খেলে সে একেবারেই থেমে পড়ত এবং কাঁধের উপর দিয়ে পিছন ফিরে তাকাত—যেন বোঝবার চেষ্টা করত ব্যাপারখানা কি! এটা হচ্ছে সেই ধরনের প্রশ্নমালারই একটি যার ধরন দেখলেই ব'লে দেওয়া যায় উত্তরটি কি: অর্থাৎ কিছুই নয়। মোটের উপর বলা যায় যে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া—আমার জন্য সহজপ্রাপ্য এবং সব চাইতে নির্ভরযোগ্য উপায় ছিল খচ্চর।

ডাক্তারেরা যে সমস্ত বগীগাড়ী ব্যবহার করতেন, সেগুলো হ'ত একটি আসনবিশিষ্ট চার চাকার একটি বা দু'টি ঘোড়ার ছোট গাড়ী। সাধারণ গাড়ীর চাইতে বগীগাড়ীকে অনেক বেশী পছন্দ করা হ'ত এবং

যখনই রাস্তায় বগী চালান সম্ভব হ'ত তখনই তা ব্যবহার করা হ'ত। বগীগাড়ীতে যাওয়া বেশ আরামপ্রদ—কেননা বাতাস, বৃষ্টি এবং তুষারের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য আরও সুবিধাজনক ভাবে নিজেকে ঢেকে ঢুকে বসা যেত। ঘোড়ার লাগামের উপর টান খুবই কম প'ড়ত এবং কাদাভরা গর্ত্তগুলি বেশ চালাকি করে পার হওয়া যেত এবং মাঠের উপর দিয়ে যাওয়া বেশ সোজা হ'ত যেহেতু খুব অল্প জায়গার মধ্যেই মোড় ঘোরান চলত। এ ছাড়া যদি কোনও কিছু বিগড়ে যেত তা শীঘ্র সারিয়ে নেওয়া খুবই সহজ ব্যাপার ছিল।

বগীর বসবার আসনটি ৩০ থেকে ৩৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হ'ত এবং তার উপরে দু'জনে বসা চলত। বসবার পক্ষে তা অবশ্য বেশ ভালই, কিন্তু শোবার পক্ষে খুব ছোট, বিশেষ করে আমার মত লম্বা লোক-দের পক্ষে। এইজন্য যখনই আমি হেলান দিয়ে আড়ভাবে শরীরটি এলিয়ে দিতাম, তখন পা দুটো উঁচু কাঠের উপর দিয়ে শূন্যের দিকে প্রসারিত করে দিতাম। যদিও এই ধরনের ভঙ্গিটি খুবই দৃষ্টিকটু তবুও একেবারে না ঘুমনোর চাইতে এইভাবে ঘুমনো অনেক ভাল। রাত্তির বেলায় যখন সকলে ঘুমিয়ে তখন অবশ্য মান-মর্য্যাদার কি দাম? অবশ্য যখনই বেশ দূরে পাড়ি দিতে হ'ত তখন বেশীক্ষণ ঘুমনো সম্ভব হ'ত না, কেননা ঘোড়া দু'টিকে ঠিক পথে চালনা করবার দায়িত্ব থাকত—কিন্তু ফিরতি পথে সোজাসুজি বাড়ীর পথে ফেরবার জন্য ঘোড়া দু'টির উপর নির্ভর করতে হ'ত—অবশ্য সব ঘোড়ার কথা নয়, দু' একটি ঘোড়ার কথা বলছি।

ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ীর উপর নির্ভর করা যেত না। অনেকরই এই ধরণের দু' ঘোড়ায় টানা গাড়ী বিপথে চ'লে যেত এবং আমি জেগে উঠে দেখতাম যে আমি এক অপরিচিত জায়গায় এসে পড়েছি। নির্মেঘ রাত্রে ধ্রুবতারা আমাকে পথের নির্দ্দেশ দিত এবং সাণ্টা ফে

রেলপথ পুব-পশ্চিমের নির্দ্দেশ দিত। এই পর্য্যন্ত গাড়ী চালিয়ে আসতে হ'ত তারপর বাঁয়ে অথবা ডাইনে দরকার মত মোড় ঘুরতে হত। মেঘ-ম্লান রাত্রে কোনও কোনও গোলাবাড়ী খুঁজে বা'র ক'রে তাদের কাছ থেকে পথের হদিস জেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকত না। দৃষ্টিপথে আসবার অনেক আগে থেকেই সাধারণতঃ কুকুরদের ঘেউ ঘেউ শুনে বোঝা যেত যে কাছেই কোনও বাড়ী আছে। কিন্তু ঐ কুকুরগুলোই বাড়ীর দিকে যাওয়ার পথ আটকাত এবং কখনও কখনও গৃহস্বামীকে ডেকে তোলা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। অশ্বশাবকদের তীক্ষ্ণ চীৎকার শুনে অতি অবশ্য গৃহস্বামী সাড়া দিতেন, যদিও কখনও কখনও গৃহস্বামী হাতে একটি ছোট বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে আসতেন এবং এই অকারণ হল্লার কারণ জানতে চাইতেন। যখনই তিনি বুঝতে পারতেন যে আগন্তুক হচ্ছেন একজন ডাক্তার তিনি নিশ্চয়ই সাহায্য করতেন—এমনকি তিনি ডাক্তারের সঙ্গে বগীতে চ'ড়ে অল্প ব্যবহৃত পথ দেখিয়ে দিতেও যেতেন।

ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ীর দু'টি প্রধান বিশেষত্ব ছিল এই যে ওরা প্রায়ই বিপথে চলে যেত, আর কিছু গোলমাল হ'লেই লাথি মেরে চালককে বগীর বাইরে ফেলে দিত। বিপথে চলে যাওয়ার জন্য দোষ দেওয়া হ'ত কুকুরদের উপর। অনেক গোলাবাড়ীরই দু'টি বা তিনটি ক'রে কুকুর থাকত—ওরা গভীর রাত্রে দেরীতে আসা ঘোড়াগুলিকে তাড়া দিয়ে নিয়ে যেতে কৌতুক অনুভব করত। এই সব ক্ষেত্রে আরোহীরা জেগে উঠে দেখত যে, ঘোড়া দু'টি রাস্তার উপর দিয়ে বা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে। যদি গাড়ীর ভীত ঘোড়া দু'টি কুকুরদের আগে আগে সোজা ছুটত তাহ'লে কোনও ঝঞ্ঝাটই হ'ত না; কিন্তু যদি কুকুরগুলো ঘোড়ার চাইতে জোরে ছুটে ওদের আগে এসে পড়ত এবং ঘোড়ার নাকের

উপর লাফিয়ে উঠত তা হ'লেই ঘোড়াগুলো প্রচণ্ড বেগে হঠাৎ মোড় ঘুরতে চেষ্টা ক'রত, তাতে বগী উল্টে পড়ত এবং মহাগণ্ডগোলের সৃষ্টি হ'ত। এ ছাড়া যদি ঘোড়াগুলো লাগোয়া প্রান্তরের উপর দিয়ে ছুটে যেত তা'হলে তারা কখনও কখনও গোলাবাড়ীর যন্ত্রপাতির উপর এসে প'ড়ত বা গভীর কোনও গর্ত্তের মধ্যে প'ড়ে যেত। সুতরাং কুকুরগুলোকে শিক্ষা দেওয়া খুবই প্রয়োজন ছিল। যদি সাবধানে তাদের গোড়ালির দিকে লক্ষ্য ক'রে একটি গুলী ছোঁড়া হ'ত তাহ'লে তারা বুঝতে পারত যে বিপদ আসছে। এছাড়া নাছোড়-বান্দা গোছের কুকুরগুলো সম্পর্কে আরোও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হ'ত। এক রাত্রে যখন আমার একজন সহকারী গাড়ী হাঁকাচ্ছিলেন, তখন এই জাতের তিনটি নাছোড়বান্দা কুকুর আমাদের তাড়া করে। পরদিন তাদের মাত্র একটিই বেঁচে ছিল!

এক রাত্রে বগীতে হঠাৎ এক বিস্ময়কর ধাক্কা খেয়ে সুখনিদ্রা থেকে জেগে উঠে দেখি, এক মজার ব্যাপার ঘটেছে। চমকে জেগে উঠে দেখি যে, বগীর ঘোড়া দু'টি অন্তর্হিত হয়েছে। তুষার ঢাকা প্রান্তরে বগীর উপর আমি বসে রইলাম—ঘোড়া দু'টি কোথায় উধাও। আসল ব্যাপার হয়েছিল কি ঘোড়া দু'টি তুষার ভর্ত্তি একটি নালার মধ্যে প'ড়ে গিয়েছিল। নালার মধ্যে প'ড়ে যাওয়ার পর উপর থেকে তুষারকণা প'ড়ে তাদের সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলেছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে কিছুতেই তাদের দেখতে পাওয়া শক্ত। কাজেই তখন কোদাল দিয়ে খুঁজে খুঁজে বরফ সরিয়ে ফেলতে হ'ল, ঘোড়ার লাগাম খুলে দিতে হ'ল, খানা থেকে দূরে বগীকে ঠেলে নিয়ে যেতে হ'ল, তারপর আবার লাগাম জুড়ে বিপরীত দিকে যাত্রা করতে হ'ল। সমস্যা হ'ল কোন দিকে যাব। এটা ছাড়াও অন্য এবং আরোও গভীর খানার সম্মুখীন হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল। এই সমস্ত ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অভিজ্ঞ

চালকরাই বুঝতে পারত তখন ঠিক কোন পথে যাওয়া উচিত হবে। সে যেখান থেকে আসত ঠিক সেই পথেই ফিরে যেত। তুষার-কণাবৃত পথেই এটা সম্ভব ছিল, কিন্তু অন্ধকার রাত্রে কর্দ্দমাক্ত পথে সে কোন পথ দিয়ে এসেছে তা বোঝাও যেমন শক্ত, কোন পথে সে যাচ্ছে তা বোঝাও তেমনই শক্ত হ'য়ে দাঁড়াত। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ডেকার্টের দর্শন মনে আসত। ডেকার্টে বলেছেন, "আমি চিন্তা করতে পারছি, অতএব আমার অস্তিত্ব রয়েছে।"—কিন্তু এ থেকে কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যাবে না যে, আমি কোথায় আছি এবং কতক্ষণ থাকব। ডেকার্টে তাঁর লাইব্রেরীতে বসে লিখেছিলেন, তাই একথা লিখতে পেরেছিলেন—যদি তিনি মাঠে হারিয়ে যেতেন তাহ'লে তিনি লিখতেন "আমি চিন্তা করতে পারছি না আর আমি কোথায় আছি জানি না।"

কিন্তু আমাদের দুঃখ দুর্দ্দশা এবং অমানুষিক পরিশ্রম করার জন্য রোগীরা তো বটেই এমন কি ভাড়াটে গাড়ীর ছোকরা চালকরাও আমাদের শ্রদ্ধা করত। আমরা আমাদের সাধ্যমত করার জন্য তাদের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করতে পারতাম। আমি যখন সেসব দিনের কথা ভাবি, আমার মনে কোনও তিক্ততা আসে না। এখন বেশ মনে পড়ছে, আমাদের অনেক অমানুষিক দৈহিক পরিশ্রম করতে হ'ত বটে, কিন্তু যথার্থ চিকিৎসা বিদ্যার প্রয়োগ খুবই কম করতে হ'ত। তবে রোগীর কষ্ট লাঘব ক'রতাম এবং সমগ্র পরিবারেরও উদ্বেগ দূর করতাম। আমি আমার সাধ্যমত ভাল ক'রবার চেষ্টা ক'রতাম এবং তার জন্যে তাদের শ্রদ্ধাও অর্জ্জন করতাম।

যখনই আমি আমার রোগী দেখার ডায়েরী খুলে দেখি, তখনই ভাবি তাদের সত্যিকার কি উপকার আমি করেছি। এ কথা খুব জোর করেই ব'লতে পারি, তাদের যে সমস্ত ওষুধ আমি দিয়েছি

তার মধ্যে রোগী সুস্থ হ'য়ে উঠুক এই আন্তরিক ইচ্ছা ছাড়া আর ত' কিছুই ছিল না। যখন আমি রোগীর কাছে হাজির হ'তাম তখন তার আত্মীয় স্বজনেরা স্বস্তি অনুভব ক'রত, কিন্তু অর্দ্ধচৈতন্য বিকারগ্রস্ত রোগীরা প্রায়ই চিকিৎসকের উপস্থিতি অনুভব করতে পারত না। ঠাণ্ডা জলে গা মুছিয়ে দিয়ে রোগীর চেতনা ফিরিয়ে আনতে বেশ বেগ পেতে হ'ত—কিন্তু তাতে রোগীর বন্ধুরা খুসী হ'ত। রোগীর শরীরের উত্তাপ ঐভাবে কমিয়ে দিয়ে আমরা ভাল করতাম কি মন্দ করতাম তা বলা সম্ভব নয়। শুধু এইটুকুই বলতে পারি, যে-চিকিৎসক নিজে বেশ কয়েক দিন রাত্রে ঘুমোতে পারেন নি, তাঁর পক্ষে ঠাণ্ডা জলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিকারগ্রস্ত রোগীর গা মুছিয়ে দেওয়া বিষম কঠোর পরীক্ষা।

তখনকার দিনে টেলিফোন ছিল না। দ্রাক্ষাকুঞ্জের উপর যে বার্ত্তা ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ত তাই থেকেই প্রতিবেশীরা জানতে পারত কখন ডাক্তারকে তাদেরই একজনের বাড়ীতে কল্ দেওয়া হয়েছে। তখন যদি অন্য কোনও পরিবারে ডাক্তারের প্রয়োজন হ'ত তাহ'লে তাদের বাইরে বাড়ীর সকলের চোখে পড়ে এমন এক জায়গায় একটি কাগজের টুকরো ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ত। যদি রাত্রে প্রয়োজন হ'ত তাহ'লে একটি লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাখা হ'ত। আমি এই সঙ্কেতচিহ্নগুলির অর্থ বুঝতাম এবং ঐ সমস্ত গৃহে যেতাম। আমার বেশ মনে আছে একবার আসল যে রোগী কল্ দিয়েছে তাকে ছাড়াও আরও সাতটি রোগী দেখতে হয়েছিল।

আমার অভিজ্ঞতায় এই সমস্ত প্রতিবেশীর ভদ্র ব্যবহারের স্মৃতি আজও মুছে যায় নি। অনেক ক্ষেত্রেই এই সমস্ত বাড়তি কল্-এর রোগীরা খুব মারাত্মকভাবে অক্রান্ত থাকত না। বিশেষ ক'রে কোনও সংক্রামক ধরনের রোগ যদি ঐ পল্লীতে দেখা দিত, তা হ'লেই অন্যান্য

পরিবার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠত এবং সংক্রামক রোগের সূচনা দেখলেই তারা ডাক্তারের পরামর্শ চাইত।

মড়কের সময়, বিশেষ ক'রে বসন্তের সময়, ক্রমে ক্রমে সমগ্র পল্লীতে একটি বা তার চাইতে বেশী লোক ঐ রোগে আক্রান্ত হ'ত। স্কুল থেকেই সাধারণতঃ এই সব রোগের সূত্রপাত হ'ত।

সাধারণতঃ এই ধরনের সামান্য অসুখে—যদি না তা থেকে জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকত—তা'হলে ডাক্তার ডাকা হ'ত না। রোগীদের বেশ করে ঢাকা দিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হ'ত—কিন্তু যখন গুটিগুলো শুকোতে সুরু করত এবং অল্পবয়সী রোগীদের শরীরে বহুস্থানেই সত্বর নজর দেওয়ার প্রয়োজন হ'ত তখন বিছানার কাপড়গুলি এ দিক ওদিক স'রে গেলে অনেকেই ব্রঙ্কাইটিস বা নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হ'য়ে প'ড়ত।

গ্রামাঞ্চলে মোটরচালনা কাহিনীর সর্বোজ্জ্বল ব্যাপারটি বর্ণনা করছি। সব চাইতে বেশী গুরুত্ববিশিষ্ট অংশ হচ্ছে হেঁচ্‌কা দিয়ে তোলা, রাস্তার উপর দিয়ে চালিয়ে যাওয়া, রোগী দেখতে হাজির হওয়া তারপর আবার মন্থর গতিতে সেই একই পথে ফিরে আসা; কাদার জন্যে চাকা আটকে যাওয়া, কোন রকম করে টেনে বের করা, তুষারবৃষ্টির সম্মুখীন হওয়া, খুঁড়ে তুষার সরিয়ে দেওয়া, বেড়ার সীমানা কেটে দেওয়া এবং নানান বাধা সরিয়ে গাড়ী হাঁকানো। গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দারা সব সময়েই দুর্দশাগ্রস্থ ডাক্তারদের সাহায্য করার জন্য উদগ্রীব থাকত। তারা গজ্‌ গজ্‌ না ক'রেই তাদের যে সব বেড়া ডাক্তারেরা কেটে দিতেন সেগুলো সরিয়ে নিত। কোনও ঘোড়া পরিশ্রান্ত হয়ে প'ড়লে তারা ডাক্তারদের কোনও কাজে লাগবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত এবং বিনা দ্বিধায় তাদের নিজেদের ঘোড়াও ডাক্তারদের দেবার জন্য প্রস্তুত থাকত। তখনকার দিনের এই ধরনের

ব্যবহার মানুষের প্রতি মানুষের ভ্রাতৃসুলভ সৌহার্দ্দের একটি চমৎকার উদাহরণ। আজকের দিনের চিকিৎসা-শাস্ত্রের জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, যথার্থ ডাক্তারি বিদ্যার প্রয়োগ তখনকার দিনে যৎসামান্যই হ'ত। মূক হওয়ার কোন কষ্টই থাকে না যদি সে নিজে তা উপলব্ধি করতে না পারে।

মোটর সৃষ্টি হবার পর গ্রামাঞ্চলের ডাক্তারদের কাছে নতুন নতুন সমস্যা উপস্থিত হ'ল। মোটর রাখা বহুকাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত ব্যয়-সাধ্য ছিল এবং গ্রামাঞ্চলে গিয়ে রোগী দেখার কাজে তাদের উপর নির্ভর করা চলত না। তা'ছাড়া রাস্তার অবস্থা এমনই থাকত যে বছরে মাসকয়েকই মাত্র সেই রাস্তা দিয়ে যাওয়া-আসা করা সম্ভব হ'ত। অবশ্য গ্রামাঞ্চলের বহু ডাক্তারই পুরনো মডেলের গাড়ী রাখতেন। উদ্বৃত্ত অর্থের সমস্তটা শুষে নেওয়ার ব্যাপারে এগুলি কেবলমাত্র বেসরকারী হাসপাতালের সমকক্ষ। শেষোক্তটির অভি-জ্ঞতা থাকায় মোটর ব্যবহার করা থেকে আমি নিজেকে বঞ্চিত রাখি; অবশ্য আমার সহকর্ম্মীরা তখন মোটরগাড়ী ব্যবহার করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন।

যাঁরা নিজেরা না চালাতেন মোটর রাখা তাঁদের কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াত এবং এ জন্য প্রায়ই বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হ'ত। কুকুরদের চীৎকার শুনলে ঘোড়ারা ভীত হয়ে পড়ত এবং দৌড়ে পালাবার চেষ্টা ক'রত কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তাদের বুদ্ধি হারাত না। কুকুরগুলো যখন ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হ'য়ে বা বন্দুকের আওয়াজ শুনে পশ্চাদনুসরণ করা বন্ধ করত তখন ঘোড়াগুলোকে শান্ত করা যেত এবং সিকি মাইল বা আধ মাইল দূরত্বের মধ্যেই তাদের বাগে আনা যেত। কিন্তু মোটরগাড়ী যখন রাস্তার উপর চলতে আরম্ভ করত তখন তা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত।

তখন ঘোড়াগুলোকে আর কিছুতেই বাগে আনা যেত না—তারা বগী উল্টে দিয়ে পিছনে ছুটতে চেষ্টা করত—বেড়া গ্রাহ্য করত না এবং বাধা দিলে আরও ক্ষেপে গিয়ে লাথি মেরে নিজের পথ পরিষ্কার করে নিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটতে সুরু করত। রাত্রিবেলায় মোটরগাড়ীর কম্পমান অ্যাসেটিলিনের আলো তাদের ভয় আরও বাড়িয়ে দিত। ঐ আলো অনেক দূর থেকেই দেখা যেত এবং তখন বগী-গাড়ীকে চালিয়ে নিয়ে কোনও গোলাবাড়ীতে বা মাঠের উপর দাঁড় করিয়ে রাখা হ'ত যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ঐ আবছায়া চলে যেত। সাঁ সাঁ শব্দ ক'রে ধীরে ধীরে মোটর গাড়ী চলে যেতে বেশ সময় নিত এবং ততক্ষণ পর্য্যন্ত বগীওয়ালাদের সন্ত্রস্ত চিত্তে অপেক্ষা করতে হ'ত। প্রায়ই মোটরগাড়ীতে গোলমাল দেখা দিত এবং তা সারাবার জন্য গাড়ী থামাতে হ'ত। এ রকম ক্ষেত্রে বগীওয়ালাদের অন্য পথে গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে হ'ত। বেশ কিছুদিন মোটরগাড়ীর সংস্পর্শে এসে অভ্যস্ত হ'বার পর কয়েকটি ঘোড়া দিনের বেলায় তাদের অতিক্রম করে চলে যেতে দিত কিন্তু রাত্রিবেলায় কখনই তাদের যেতে দিত না। এর ফলে এই অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হত যে কখন মোটরগাড়ী এসে হাজির হবে এই ভয়ে কেউ বগীর মধ্যে ঘুমতে সাহস করত না। সৌভাগ্যবশতঃ রাস্তা যখন কর্দ্দমাক্ত থাকত বগীগাড়ীকে বাধ্য হ'য়ে ধীরে ধীরে চালাতে হ'ত এবং তখন পথে মোটরগাড়ীর সঙ্গে দেখা হওয়ার ভয় থাকত না।

মোটরগাড়ী ক'রে রোগী দেখতে যাওয়ার রেওয়াজ চলিত হবার পর আমার সহকারীরা গ্রামাঞ্চলে গাড়ী চালিয়ে যেতেন—তাঁরা সোঁ সোঁ শব্দ করে মোটর চালিয়ে যেতেন—ঐ সমস্ত গাড়ীর উপর নির্ভর করা চলত না। কিন্তু যখন ট্রেণে চেপে যাওয়ার মতই মোটর চেপে যাওয়ার রেওয়াজ চলিত হল, এবং আমারও কার্য্যক্ষেত্রের পরিধি

বেড়ে গেল তখন আমাকেও বহুবার মোটরে চেপে রোগী দেখতে যেতে হয়েছিল। প্রায়ই রোগীর উপর অস্ত্রোপচার করবার জন্য ডাক পড়ত এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে যতই তাড়াতাড়ি ক'রে রোগীর কাছে হাজির হ'বার জন্য ব্যগ্র প্রচেষ্টা করা হ'ত যাতে দিনের আলো থাকতে থাকতেই অস্ত্রোপচার শেষ করা যায়, ততই নানান্ ধরনের বাধা এসে উপস্থিত হ'ত এবং তাতে পথশ্রম ও বিপদের মাত্রা আরও বেড়েই যেত। ঐ কারণেই একবার ষাট মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করতে ছ'বার গাড়ীর চাকা ফেটে যায় এবং শেষ পর্য্যন্ত রোগীর পিত্তাশয়ের চিকিৎসা ক'রতে হয় একটি তৈল প্রদীপের এবং ফ্ল্যাশলাইটের আলোতে।

আর একটি ঘটনা আমার মনে পড়ছে। সন্ধ্যা হবার আগেই যাতে আমি পৌঁছে গিয়ে একটি রোগীর সাঙ্ঘাতিক 'অ্যাপেনডিসাইটিস' অস্ত্রোপচার করতে পারি এই উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছিলাম। সমস্ত পথ ছিল কর্দ্দমাক্ত এবং রাস্তার আগাগোড়া ছিল অগম্য। কেবলমাত্র বাঁ দিকটা দিয়ে চলাচল করা সম্ভব ছিল। অথচ বাঁ দিকের পথটি অবরুদ্ধ ক'রে চলছিল আসবাব-পত্র বোঝাই একখানি ট্রাক। পুরনো ধরনের একটি রবার-হর্ণ আমি বার বার বাজাতে সুরু করলাম। তখনকার দিনের ট্রাক-ড্রাইভার-সুলভ মনোবৃত্তির জন্য ঐ ট্রাকের ড্রাইভার কিছুতেই পথ ছেড়ে দিয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে দিলে না। তখন আমি আমার বন্দুক তুলে নিয়ে তার ট্রাকের পিছনের বাঁ দিকের চাকা লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লাম এবং গুলী ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে ডানপাশে সরে গেল এবং গাড়ী থামাল। আমিও থামলাম এবং নিজের পরিচয় দিলাম। তাকে বুঝিয়ে বললাম যে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিশেষ একটি জায়গায় আমাকে পৌঁছতে হবে এবং রোগী দেখার পর সে যদি আমার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে চায়

তাহ'লে আমি সুখীই হব। সে কিন্তু গেল না। আমিও দিনের আলোতেই 'অ্যাপেনডিক্স্' অপারেশান শেষ করলাম।

ঐ কয়েক বছর ধ'রে আমার 'টি' মডেলের উপর একটা আকর্ষণ জন্মাল। ঐ মডেলের গাড়ীগুলোর উপর নিভর করা চলত—তারা ঠিক সময়ে আমাকে গন্তব্য স্থানে পৌছে দিত এবং আবার ফিরিয়ে আনত, যদিও ঐ যাওয়া-আসার সময় আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। পথিমধ্যে যদি টায়ারগুলি নষ্ট হয়ে যেত তাহ'লে ওগুলো রিম্ থেকে খুলে নেওয়া হ'ত এবং কেবলমাত্র রিমের উপর নির্ভর করেই গন্তব্য স্থানে যাওয়া যেত। উঁচু নীচু সুদীর্ঘ দু'শো বা তিনশো মাইল দীর্ঘ পথ 'টি' মডেলের গাড়ীতে অতিক্রম করবার সময় মানুষের দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ঝাঁকুনি খেয়ে যেন ছিঁড়ে যেত—তবে কোনও রকমে গন্তব্য স্থানে পৌছনো যেত।

তখনকার দিনের গাড়ীগুলোর চারদিক ঢাকা থাকত না এবং প্রথম দিককার গাড়ীগুলোর ছাদও থাকত না, এমন কি বাতাস রোধকারী কাচও থাকত না। ঐ ধরনের গাড়ী ক'রে রোগী দেখতে যাওয়ার একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। সামনের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের চেহারা দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে একটি তুষার ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে। তুষার এবং শিলাবৃষ্টি এক সঙ্গেই পড়ছিল। বাতাস বইছিল উত্তর পশ্চিম মুখে। এই পথেই পঁচাত্তর মাইল আমাদের যেতে হয়েছিল। গাড়ীর চারদিকে কোনও আবরণ ছিল না, ছাদও ছিল না বা বাতাস রোধকারী কাচের আবরণও ছিল না। তাপের মাত্রা ছিল শূন্য ডিগ্রীরও বেশ নীচে। যদিও কম্বল ছিল এবং কোলের উপর ঢাকা দেওয়ার ছোট পরিচ্ছদ এবং আরও অনেক কিছুই ছিল তবু ঠাণ্ডার প্রকোপ ছিল প্রচণ্ড এবং জনকয়েক প্রাচীন ব্যক্তি হাসতে হাসতে এই ভবিষ্যৎ বাণীই করলেন যে আমরা কিছুতেই গন্তব্যস্থানে

পৌঁছতে পারব না। জনৈক হাসিখুসী বুড়ো ভদ্রলোক টিপ্পনী কাটলেন: "পৃথিবীর সমস্ত বাধা উপস্থিত হ'লেও ডাক্তারকে কেউই থামাতে পারবে না—তবে আমার ভয় হচ্ছে ও বোধ হয় আজ রাত্রেই ওখানকার মাটি নেবে।" এই ভদ্রলোকটি আগে আমার দেশেই বাস করতেন। আমাদের ঐ যাত্রাপথে একদল গরুবাছুর এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশুর দলকে যেতে দেখলাম—ওদের মধ্যে কেউ কেউ মাটিতে শুয়ে পড়েছে আর কেউ কেউ বা ঝড়ের গতির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। খুব অল্পের জন্যই কয়েকজনকে ধাক্কা দিতে দিতে সামলে গেলাম—তখন আমি ড্রাইভারকে ধমক দিয়ে গাড়ী আস্তে চালাতে বললাম। উত্তরে সে বললে, "ডাক্তারবাবু, গ্যাস বন্ধ করা যাবে না, আর আমিও ব্রেক কষতে পারব না কেননা আমার পা অত-দূরে পৌঁছবে না।" তার পা দু'টো মোষ ঢাকা দেওয়ার একটি পুরণো কম্বলে মোড়া ছিল এবং পেডালটি বেশ দূরেই ছিল। আমরা পঁচাত্তর মাইল দীর্ঘ পথটি সাড়ে চার ঘণ্টায় অতিক্রম করলাম। ঐ সহরের ডাক্তারের সঙ্গে তখন আমার দেখা হয়ে গেল এবং ওখান থেকে আরও ষোল মাইল পথ আমাকে এগিয়ে যেতে হ'ল—ওখানে গিয়ে দেখলাম যে রোগীর মাথার একটি ফোড়া বেশ ভালভাবেই অস্ত্রো-পচার করা হয়ে গেছে। পথ অতিক্রম করা শেষ হ'বার পর যদি কিছু কাজ করতে পাওয়া যেত তাহলে পথশ্রম শীঘ্রই ভুলতে পারা যেত।

ঘোড়ায় চেপে যাওয়া, বগীগাড়ীতে যাওয়া বা মোটরে চেপে যাওয়া ভীষণ কষ্টকর ব্যাপার ছিল—কিন্তু ট্রেনে চেপে যাওয়ার কষ্ট ছিল এর থেকে অনেক বেশী। সাধারণতঃ পর্য্যটনের সময় কিছু পথ যেতে হ'ত ট্রেনে, কিছু পথ মোটর গাড়ীতে এবং বাকী পথ বগীগাড়ীতে। বগী-গাড়ীতে বা মোটরে যাবার সময় একদিনের মধ্যেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছন

যেত কিন্তু ট্রেনে যাওয়ার সময় বেশ কয়েকদিন সময় লাগত। যতই অন্যান্য ডাক্তারদের সঙ্গে আমার পরিচয় বাড়তে লাগল ততই আমার কর্ম্মক্ষেত্রের পরিধি আরও বাড়তে সুরু হল। বহুবারই রাতের পর রাত আমাকে ট্রেনে কাটাতে হয়। আমার জীবনে সব চাইতে বেশী সময় ট্রেনে কাটাতে হয় ১৯১৬ সালের জানুয়ারী মাসে—তখন একাদিক্রমে ছাব্বিশটি রাত আমাকে ট্রেনে কাটাতে হয়েছিল—এটা অবশ্য খুবই বাড়াবাড়ি!

আমার প্রায় সমস্ত কল্‌ই আসত ছোট ছোট সহর থেকে, কাজেই আমাকে লোক্যাল ট্রেনে বা শাখা লাইনের ট্রেনে চেপে যেত হ'ত। "সু-বক্স" নামক কতকগুলি কামরা থাকত ট্রেনে। "পীনাট স্পেশ্যাল" এর একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত। মিসৌরীর অনেক অধিবাসী একে চিনতে পারবে। ক্রমে ক্রমে ট্রেনে বহু 'ক্রু'-র সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল। আমার ছোট সহরের বিশেষ একটি সীমানায় ট্রেন থামবার নির্দ্দেশ ছিল না—কিন্তু ওদের মধ্যে কেউ কেউ যখন আমার ছোট সহরের উপর দিয়ে যেত তখন তাদের গতি কমিয়ে দিত। তখন তারা ট্রেনের গতিবেগ কমিয়ে আনত ঘণ্টায় চার অথবা পাঁচ মাইলে যাতে আমি লাফিয়ে ঐ চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে পারি। কখনও কখনও ট্রেনগুলো এমন জোরে চলত, যা আমি অনুমান করি নি, ফলে বার কয়েক আমি প'ড়ে গিয়ে আঘাত পাই। একবার পড়ে যাই পথের উপর তপ্ত অঙ্গারের মধ্যে এবং তাতে আমার হাতটি ছ'ড়ে যায়। একটি রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করার কথা ছিল, কিন্তু আমার এই হাতের জন্যে আমি তা সুষ্ঠুভাবে করতে পারি নি। সাধারণতঃ আমি অক্ষত দেহে চলন্ত ট্রেন থেকে নামতাম। অল্পবয়সে ঘোড়ায় চড়তে গিয়ে আমি শিখেছিলাম পড়ে' যাওয়ার সময় ঘোড়ার লাগাম ধ'রে থাকার চেষ্টা না ক'রে কেমন ক'রে ঘোড়ার পিঠের উপর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে হয়। পড়ার মধ্যেও যে 'আর্ট' আছে, এটিই তার প্রমাণ।

ট্রেনের লোকেরা আমার প্রতি খুব ভদ্র ব্যবহার করত এবং আমিও তাদের খুব শ্রদ্ধা করতাম। রেলপথের বহু লোককেই আমি আমার বিশেষ বন্ধু বলে মনে করতাম। কেমন করে জানি না আমাদের সকলেরই কথা বলার ভাষা যেন একই ছিল।

যেদিন থেকে আমি 'পুলম্যান'-এ চড়া সুরু করতে সমর্থ হলাম সে দিন থেকে পথের কষ্টকে আমি গ্রাহ্যই করতাম না। গাড়ীগুলো আমার কাছে বাড়ী ব'লে মনে হ'ত। আমি পোর্টারদের চিনতাম এবং তারাও আমার সুখ-সুবিধার প্রতি নজর রাখত। অবশ্য ঝঞ্চাট যে একেবারেই আসত না তা নয়। এক রাত্রে এক জার্ম্মান দম্পতি আমার পাশের কামরাটি দখল করলে। তারা সমানে বক্ বক্ করে যেতে লাগল। পোর্টার তাদের বুঝিয়ে বলল যে, এক ডাক্তার রয়েছেন তাদের পাশের কামরায় এবং তাঁর ঘুমনো খুবই দরকার। তাতে ফল এই হল যে তারা আরও ভীষণ জোরে কথাবার্ত্তা বলতে সুরু করল এবং আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে লাগল কোথায় যাচ্ছে এই সহযাত্রী ডাক্তারটি। আর এক দম্পতী পোর্টার ঠিক সময়ে ডেকে দেবে কি না দেবে এই ভেবে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল একটি অ্যালার্ম ঘড়ি। কারণ তাদের উঠতে হ'বে ভোর তিনটেয়। গন্তব্য স্থানে পৌছবার আগে যাতে তারা বেশ খানিকক্ষণ সময় পায় এই জন্য ঘড়িতে রাত দু'টোয় অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিল।

তখনকার দিনের গ্রামাঞ্চলের হোটেলগুলি সম্পর্কে কিছু না বললে আমার ভ্রমণকাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যেত যে ওগুলো কাঠের তৈরী। এখনকার দিনে যেমন আসবাবপত্র সাজান ঘর ভাড়া দেওয়া হয়, এগুলিও ঠিক সেই ধরনের। ওদের সাধারণতঃ দু'টো শ্রেণীতে ফেলা যায়—প্রথম এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ কতকগুলিতে ছারপোকা নেই এবং কতকগুলিতে ছারপোকা আছে।

এই ধরনের হোটেলের অফিস ঘরগুলিতে একটি করে বড় লাল

ষ্টোভ থাকত এবং ভ্রমণকারীদের চিঠি লেখা বা তাস খেলার জন্ম একটি ক'রে টেবিল থাকত। রাত্রিবেলায় যখন আর সেই টেবিলর কারও দরকারে লাগত না তখন হোটেলের মালিক ঐ টেবিলের উপর একটি লণ্ঠন জেলে রেখে শুতে যেতেন। যদি কোনও আগন্তুক দেরীতে আসতেন এবং এই সঙ্কেতটি বুঝতেন, তাঁরা জানতেন যে ঐ হোটেলে রাত্রিবাসের জন্ম তখনও একটি ঘর খালি আছে। তখন তিনি লণ্ঠনটি নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেন এবং কোন ঘরের দরজা খোলা আছে তা খুঁজে বার করতেন। যে ঘরের দরজা খোলা থাকত তিনি বুঝতেন সেই ঘরটাই তিনি ব্যবহার করতে পারেন। শীতকালে এইভাবে ঘর খুঁজে বার করা খুবই সোজা হ'ত, কিন্তু মুস্কিল হ'ত গ্রীষ্মকালে। কেননা যাতে সামান্য একটু বাতাসও ঘরে ঢুকতে পারে এই আশায় প্রায়ই অতিথিরা এ সময়ে তাঁদের ঘরের দরজাগুলো খুলে রাখতেন—এবং সেই জন্ম দেরীতে এলে আগন্তুককে একটির পর একটি ঘর খুঁজে দেখতে হ'ত কোনটি খালি আছে। ভদ্র এবং বিনীত লোকেরা ঘরটি খালি আছে কিনা জানবার জন্ম বিছানার দিকে না চেয়ে চেয়ারের উপর ফেলে রাখা ছাড়া জামা কাপড় আছে কি না লক্ষ্য করে দেখতেন।

খালি ঘর খুঁজে বার করবার পর গ্রীষ্মকালে দেখতে হ'ত বিছানায় ছারপোকা আছে কিনা, আর শীতকালে দেখতে হত গায়ে দেবার লেপ কম্বল আছে কিনা। কোনও ঘরেই আগুন জ্বালা থাকত না, সেই জন্ম বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় গাড়ী চালিয়ে আসার পর যে সমস্ত লেপ কম্বল পাওয়া যেত প্রায়ই তা অপর্য্যাপ্ত বলে মনে হ'ত। সেই জন্ম ডাক্তার তাঁর ওভারকোটটি খুলে বিছানার উপর রাখতেন এবং হামাগুড়ি দিয়ে লেপের মধ্যে ঢুকতেন। প্রায় সব ক্ষেত্রেই একমাত্র সমস্যা দেখা দিত, শুতে যাবার আগে জুতো পরে অথবা খুলে শুতে হবে এই ব্যাপার নিয়ে।

যদি বিছানার চাদরের উপর তুষারকণা প'ড়ে থাকত তাহ'লে তিনি জুতো পরেই শুয়ে পড়তেন। যদি সকাল বেলায় মালিক উঠার আগেই কাউকে হোটেল ছেড়ে যেতে হ'ত তাহলে সেই অতিথি লণ্ঠনটি নিয়ে হোটেলের অফিস ঘরে যেতেন এবং ওর নীচে একটি সিকি ডলার বা আধ ডলার রেখে দিয়ে দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিতেন। হোটেলের মালিক তখন বুঝতেন যে ঐ অতিথি হোটেলের একজন মুরুব্বি—এ বিষয়ে অন্য কোনও সন্দেহই থাকত না যখন তিনি জানতে পারতেন যে অতিথি জুতো পরেই রাত কাটিয়েছেন।

সাধারণতঃ হোটেলের অপ্রীতিকর বাসস্থানের জন্য যদি নিকটবর্ত্তী কোনও জায়গায় একটি ডিপো এবং রাত্রিকালীন প্রতিনিধির সন্ধান মিলত আমি সেখানেই রাত কাটানো বেশী পছন্দ করতাম এবং টেলিগ্রাফের সঙ্গে তাঁর ডিপোতে একসঙ্গে রাত কাটাতাম। যদিও ডিপোর আভ্যন্তরীণ কক্ষে অন্য কোনও লোককে ঢুকতে দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল তথাপি ওঁরা কিন্তু কখনও আমাকে চলে যেতে বলেন নি। সাধারণতঃ ঐ সমস্ত অফিসের মারফতই ডাক্তারদের কল্ দেবার বার্ত্তা পাঠান হত, ওরাও অপরিচিত ডাক্তারের আগমন কিছুটা প্রত্যাশা ক'রে থাকত। ঘরগুলি সব সময়ই গরম থাকত। আমি টিকেটের টেবিলটি খাট হিসাবে ব্যবহার করতাম এবং আমার ডাক্তারি যন্ত্রপাতির ব্যাগটি বালিশের মত মাথায় দিয়ে অচিরেই ঘুমিয়ে পড়তাম। আমি বহু ঘণ্টা এই ধরনের বাসস্থানে সুখেই কাটিয়েছি।

সব চাইতে বড় কথা হচ্ছে এই যে আমি বহু কৌতূহলোদ্দীপক কেস্ দেখেছি—তুচ্ছ রোগ, পুনর্জীবন লাভ করা, জীবনের শেষ অবস্থা এবং এমন আরও অনেক কেস্ যা ডাক্তারদের চেম্বারে বা হাসপাতালে দেখবার সুযোগ হয় না।

ডাক্তার এবং রোগীদের মধ্যে বহু লোকেরই সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব

গ'ড়ে উঠেছিল—সে সব কথা মনে হলে খুব আনন্দ পাই। কিন্তু সে সব দিন যে চিরদিনের মত চলে গেছে তা ভাবলে আমি সুখী হই—আমার নিজের তরফ থেকে তো বটেই এমন কি আমার পরবর্ত্তীকালে যে সমস্ত তরুণ চিকিৎসক কর্ম্মক্ষেত্রে নামবে, তাদের তরফ থেকেও। সে সব দিনের কথা যখনই আমার স্মৃতিপথে উদিত হয়, অতি কঠোর নৃশংস অভিজ্ঞতা আমাকে গভীর দুঃখ দেয়। এই অভিজ্ঞতা এখন অতীত দিনেরই কাহিনী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা হ'লেও আজকের দিনের তরুণ ডাক্তারকে যদি এত দুঃখ কষ্ট সহ্য ক'রে রোগীর কাছে হাজির হতে হ'ত এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসে রোগের গতিপথ নির্ণয় করতে হ'ত তা হ'লে পীড়িত মানবতার দিকটাও তার কাছে বোধগম্য হওয়ায় সম্ভাবনা যথেষ্টই থাকত। এর কারণ যাই হোক না কেন, আজকের দিনের মত হৃদরোগে খুব কম ডাক্তারই তখনকার দিনে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ত। তখনকার দিনের ডাক্তারদের মৃত্যুর সব চাইতে সম্মানজনক উপায় ছিল ঠাণ্ডা লাগিয়ে নিউমোনিয়া জরাক্রান্ত হওয়া।

এই সূত্রে এ কথাও ব'লে রাখা যেতে পারে যে, ডাক্তারদের অনেক সময় বোকা বলা হয়। কারণ তাঁরা নাকি রোগ কমাবারই চেষ্টা করেন। তাতে তাঁদের ব্যবসারই ক্ষতি হয়। এটি নির্বোধোচিত অভিমত। মহামারীটা ঠেকিয়ে আমরা ছেলেদের বাঁচিয়ে রাখি, যাতে তারা ক্রমে বুড়ো হ'য়ে টাকাকড়ি জমায় তারপর বাত, রক্তচাপ ইত্যাদিতে ভোগে। বসন্তর মহামারীর সময় চিকিৎসা ক'রে যা পয়সা না হয়—এক বেতো রোগীর কাছে থেকে তার চেয়ে ঢের বেশী রোজগার হয়। আমার খাতাপত্র দেখিয়ে তা আমি সপ্রমাণ ক'রে দিতে পারি।

তা ছাড়া আমরা কেন যে ডাক্তারী বিদ্যার আরও প্রসারের চেষ্টা

করছি তার কারণ আছে। আমি স্বীকার করি যে, ডাক্তাররা এক এক সময় ভুল করেন। এ কথা স্বীকার ক'রে আমি বোধ করি আমাদের ব্যবসায়ের গোপন কথাই প্রকাশ ক'রে ফেললাম। ঠাট্টার ছলে আমাদের বিরুদ্ধে মানুষ মারার সম্বন্ধে যে অভিযোগ করা হয়—সত্যি মারা গেলে তা আমাদের মন থেকে মুছে যায় না। রোগটা আমাদের হাতেই থাক আর হাতের বাইরেরই হোক—রোগী মারা গেলে ডাক্তারের মনে সেটা বেশ গেঁথে যায়। তাতে মনে ভয়ানক ঘা লাগে এবং আমরা চেষ্টা করি যাতে আর সে রকমটা না ঘটে। কে একজন ব'লেছিলেন যে মানুষ সত্তর বছর বয়স অবধি বাঁচে। আমার মনে হয় তিনি ডাক্তারদের সম্বন্ধেই সে কথা বলতে চেয়েছিলেন। কারণ সত্তর বছর বয়স হ'তে হ'তে মনের মধ্যে পুরণো মর্মান্তিক ঘটনাবলীর স্মৃতি বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় এসে পৌছয় যে মনে হয় সেইটাই বোধ হয় ধৈর্য্যের শেষ সীমা। তিনি যে কত রোগী বাঁচিয়েছেন তা আর মনে থাকে না। অথচ রোগীর মৃত্যুর স্মৃতি যেন 'ব্যাঙ্কো'র প্রেতাত্মার মত ঘাড় থেকে নামতে চায় না। হঠাৎ বিষিয়ে যাওয়া, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে যাওয়া ইত্যাদি রোগের স্মৃতি সর্বদাই মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। আরও মুস্কিল হ'চ্ছে এই যে, নিজেরই সেটা হ'তে পারে এই চিন্তাটা মাথায় ঢুকে থাকে। এই সব জিনিষই মানুষকে আরও জ্ঞান অর্জনে প্রলুব্ধ করে, যাতে ক'রে আগেকার ভুল সংশোধন ক'রে সেই জ্ঞান আমাদের আরও সুরক্ষিত করতে পারে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গাঁয়ের ডাক্তার দিনের বেলায় গাঁয়ের পথে গাড়ী চালিয়ে চলেছেন —ক্লান্ত ঘোড়া তাঁর গাড়ীটা টেনে নিয়ে চলেছে: আগের পরিচ্ছেদে এই পরিচিত ছবিটাই এঁকেছি। কিন্তু রাত্রি বেলায় যে ওই ছবির পরিবর্ত্তন হ'ত সেটা বিশেষ কেউ ভাবে না।

তবুও রাস্তায় যা ঘটত তা ত' সবাই দেখতে পেত কিন্তু রোগীর ঘরের অবস্থাটা কেউই অতটা জানতে পারত না। প্রত্যেক পরিবারই অবশ্য আপন আপন রোগীর ব্যাপার জানত কিন্তু গাঁয়ের ডাক্তারের স্মৃতি হ'চ্ছে সারা গাঁয়ের দুঃখ দুর্দ্দশার ইতিহাস। কোনও বৃদ্ধ ডাক্তারই তাঁর অভিজ্ঞতার ইতিহাস লিখতে পারলেও লিখতে চাইবেন ব'লে মনে হয় না। রোগের ছবি শিল্পীরা ইচ্ছে ক'রেই ফুটিয়ে তোলেন না, কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতার আর কোনও বিষয় দিয়েই এর মত এত সহজে মানুষের তীব্র হৃদয়াবেগের পরিচয় ফুটিয়ে তোলা যায় না। কেবল একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হ'চ্ছে "ডাক্তার" নামক বিখ্যাত ছবিটি—অনেক বাড়ীর দেওয়ালেই এটি শোভা পায়। এটি একটি সত্যিকারের স্বাভাবিক ঘটনার মত দেখায়। একটি বৃদ্ধ ডাক্তার তাঁর রোগিণীর পাশে ব'সে আছেন। রোগিণীর হাতটা প্রসারিত—রোগের শেষ অবস্থার নীরব সাক্ষ্য। পিছনেই বাপ মাকে দেখা যাচ্ছে···অসহায় নিস্পন্দ। বৃদ্ধ ডাক্তারের মুখের চেহারা সম্পূর্ণ শান্ত। কিন্তু মনের মধ্যে তাঁর কি ভাব তোলাপাড় করছে কে জানে! তিনিও কি অসহায় বাপ-মার সঙ্গে যোগ দিয়ে বিলাপ করবেন? ডাক্তারও হয়ত সত্যিই অসহায়। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের কাজ নিয়ে পড়ে থাকেন, এবং রোগীর প্রতি ও রোগীর পিতামাতার প্রতি শেষ কর্ত্তব্য পালন

করেন। এই দুঃসময়েও তাঁর নীরব সাহায্যের জন্মেই তাঁকে সবাই এত ভালবাসে। গাঁয়ের ডাক্তার সাধারণতঃ কম কথা বলেন—তাছাড়া বলবার কিই বা আছে ?

এখনকার সঙ্গে তুলনা করলে তখনকার দিনে উন্নতি অত্যন্ত যৎসামান্য হয়েছিল ব'ললেই চলে। কিন্তু একটি উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কতখানি চেষ্টা করা হয়েছে, তা দিয়েই জীবনে কতখানি সন্তোষ এসেছে তার পরিমাপ করা যায় প্রকৃত পাওয়া দিয়ে নয়। তখনকার দিনের চিকিৎসা ব্যবসায়ের মূলমন্ত্রই ছিল এই। কতক পরিমাণে এখনকার দিনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কেও একথা খাটে।

যাই হোক ডাক্তারীর দিক দিয়ে তখনকার ডাক্তাররা যতটা করতে না পারুক, ডাক্তারের আগমনেই রোগী বেশ একটু নির্ভয় হ'ত। মোটামুটিভাবে বলা যায়, রোগীর বুদ্ধিবৃত্তি ও অতীত অভিজ্ঞতা কম বা বেশী থাকলে রোগ উপশমে ডাক্তারের ব্যক্তিগত সংস্পর্শ যথাক্রমে বেশী বা কম প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যেমন ধরুন, আমি একবার এক বৃদ্ধা মহিলার বুক পরীক্ষা ক'রেছিলাম স্টেথস্কোপ দিয়ে। ভদ্রমহিলা আগে কখনও স্টেথস্কোপ দেখেন নি। তিনি ভাবলেন ঐ যন্ত্রটা দিয়েই আমি চিকিৎসা করলাম। তিনি সোৎসাহে বারকয়েক নিশ্বাস টেনেই বললেন, "আমি এরই মধ্যে বেশ ভাল বোধ করছি।" রোগীর চিকিৎসায় ডাক্তার কতটা সাফল্য লাভ করেছেন, তা উপলব্ধি ক'রতে হ'লে নিম্নোক্ত দু'টি দিক থেকে তার বিচার ক'রতে হ'বে : পরিচিত ওষুধ দিয়ে অবিলম্বে যন্ত্রণার উপশম করা এবং রোগটা সারানো অথবা অন্ততঃ মৃত্যুটা ঠেকিয়ে রাখা। সবচেয়ে প্রথম কাজ হ'চ্ছে, যে-কোনও উপায়ে রোগীকে খানিকটা আরাম দেওয়া, যাতে ক'রে ডাক্তারের চিকিৎসায় তার বিশ্বাস হয়।

আমার পুরণো 'নোট বই এখনও আমার কাছে আছে। এতে

প্রায় সমস্ত রোগী দেখার বিবরণ ও তাদের চিকিসায় যা ওষুধপত্র দিয়েছিলাম তা লিপিবদ্ধ আছে। আমার মনে আছে প্রথম দিকেও কয়েকটা রোগীর খবর পেয়েই বুঝতে পারতাম, সেখানে আমার যাবার কোনও দরকার নেই বা হয়ত কোনও ক্ষেত্রে গেলে পয়সাও বিশেষ পাব না। এমন ঘটনাও দেখেছি যেখানে হয়ত কিছুই ঘটে নি বা ডাক্তার যাওয়ার আগেই রোগ সেরে গেছে। হয়ত একটা ছেলে প'ড়ে গেছে—তার যত না লাগুক, তার মা'র চিন্তা তার চেয়ে বেশী হ'য়ে দাঁড়ায়। কিছুই হয় নি দেখে বাপ-মা'র ভাবনা দূর হ'ল। কিছু যে হয় নি তা দেখবার জন্যে ডাক্তারী বিদ্যার দরকার হয় না। অনেক সময় দেখেছি তামাক খেয়ে মাথা ঘোরা বা কাঁচা পেয়ারা খেয়ে পেট কামড়ানো অথবা মূত্রাশয়ের পাথুরি ইত্যাদি ডাক্তার আসার আগেই সেরে গেছে। অবশ্য পাছে আবার অসুখটা দেখা দেয় তাই কিছু ওষুধ রেখে আসতেই হয়। শুধু মুখের দু'টো উপদেশ দিলে ডাক্তারের আর্থিক কোনও উপকার হয় না, তার চেয়ে দু'টো বড়ি দিলে ডাক্তারেরও অর্থাগম হয়, রোগীরও মনে সান্ত্বনা হয়। এটুকু সামান্য ঠকানোয় কোনও দোষ নেই। অথচ পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাসও বাড়ে।

ঠাকুরমা ধরণের লোককে সাধারণতঃ ভয় করতাম। কারণ তিনি অনেক কিছু দেখেছেন এবং এক এক সময় যখন ডাক্তার পাওয়া যায় নি তখনও দেখেছেন রোগী আপনা থেকেই ভাল হ'য়ে গেছে। তিনি ছোকরা ডাক্তারদের মোটেই পছন্দ করতেন না, এবং অমুক বুড়ো ডাক্তারকে ডাকলেই ভাল হ'ত ব'লে খুঁতখুঁত করতেন। গোঁফদাড়ি থাকলেই একটু প্রবীণ গোছের দেখায়, কাজেই অনেক ছোকরা ডাক্তারই গোঁফদাড়ী রেখে ভারিক্কী হওয়ার চেষ্টা ক'রত—তার ফলে প্রায়ই রাশভারি হওয়ার চেয়ে হাস্যাস্পদ হ'য়ে উঠত বেশী

কিন্তু ঠাকুরমাদের জয় করাও কিছু শক্ত কাজ ছিল না। তাঁদের ধারণা তাঁদের নিজেদের সেবা ইত্যাদি করার অনেক গুণ আছে। সেই ব'লে তাঁদের একটু খোসামোদ করলেই তাঁরা ছোকরা ডাক্তারের উপর খুসী হ'য়ে যেতেন।

সত্যিই ঠাকুরমাদের অনেক গুণ ছিল। গায়ে ফুসকুড়ি ইত্যাদি বেরুলেই সেটা কি রোগ চট ক'রে বলা যায় না। আমি এক রোগী দেখে চট ক'রে কোনও মত দিই নি কিন্তু এক ঠাকুরমা বাইরে থেকে এসে একবার গন্ধ শুঁকেই সংক্ষেপে বললেন "হাম নিশ্চয়ই"। পরে অবশ্য দেখা গেল সত্যিই হাম, কিন্তু গন্ধ শুঁকে হাম ধরতে পারা যায় তা আমার ধারণাই ছিল না। এই সব ঠাকুরমারা ছাড়া আরও বহু লোকের কাছ থেকেই আমরা শিক্ষা সঞ্চয় করেছি। অনেক বৃদ্ধ ডাক্তার ছিলেন, যাঁরা কোনও কালে স্কুলে যান নি, অথচ অভিজ্ঞতায় অনেক কিছুই শিখেছিলেন। এই রকম একজনের কাছ থেকে একটি জিনিষ শিখেছিলাম, যা অনেক দিন মনে থাকবে। এক ধরনের রোগে অনেক ছেলে ছোকরা মারা যাচ্ছিল—তাইতে আমাকে একবার পরামর্শের জন্য ডাকা হ'য়েছিল। গায়ে অনেকটা হামের মত বেরিয়েছিল অথচ তার মধ্যে আবার ছোট ছোট ব্রণর মত ছিল যাতে ক'রে ঠিক বসন্তর মত মনে হচ্ছিল। বৃদ্ধ ডাক্তার বললেন, এ হাম। কালক্রমে জানা গেল তিনি ঠিকই বলেছেন। আমি এ ধরনের জটিল হামের কথা কখনও শুনি নি এবং রক্তস্রাবযুক্ত বসন্ত ব'লেই ধ'রে নিলাম। আগে যা দু'একটা দেখেছিলাম—এ কতকটা সেই রকমই দেখতে। ক্ষত-গুলি থেকে রক্তস্রাব হচ্ছিল সত্যিই, কিন্তু আমি জানতাম না যে হামেও ও রকম হয়। যা হোক, রোগীর দিক থেকে ওতে বিশেষ কিছু আসে যায় না, কারণ হামই হোক বা বসন্তই হোক ওতে রোগীকে বাঁচান মুস্কিল। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে আমার যৌবনের গর্ব্বেতে বেশ একটু

আঘাত লাগল। এই সব আবছা ঘটনার চেয়েও দু'একটা সুনির্দিষ্ট ঘটনাই ধরা যাক যা তখনকার যুগে গাঁয়ে সাধারণতঃ ঘটত।

সাধারণতঃ খবর এসে পৌছত কোনও এক ঘোড়সওয়ার মারফৎ। উত্তেজিত ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে সে রাস্তা দিয়ে সবেগে চ'লে এসেছে। চলচ্চিত্রেও কখনও এরকম দর্শনীয় ছবি তুলতে পারে নি। ঘোড়-সওয়ার খালি এইটুকুই জানত যে ডাক্তারের খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার—কিন্তু রোগটা যে ঠিক কি ধরনের তার বিন্দুবিসর্গও বলতে পারত না।

ডাক্তারের প্রস্তুতির জন্যে আগে-ভাগেই রোগের বিষয় কিছু খোঁজ খবর না দিতে পারায় দু'টো মুস্কিল হ'ত। ঠিক কি ধরনের ওষুধ বা যন্ত্রপাতি নিতে হ'বে ডাক্তারের পক্ষে তা বোঝা মুস্কিল আর অন্য কোনও 'কল্' থাকলে কোনটা যে বেশী দরকারী তাও আন্দাজ করা কঠিন। আমি সাধারণতঃ আগে শিশু, তারপর স্ত্রীলোক, তারপর বৃদ্ধ এবং সব-শেষে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ—এই হিসেবে গুরুত্বের তারতম্য করতাম। জানা শোনা দু'একটি রোগী ছিল, যারা কথায় কথায় মূর্চ্ছা যেত, তাদের কাছে যেতাম একেবারে শেষে। গোড়াতেই শিশু রোগীদের দেখার কারণ হ'চ্ছে, তাদের রোগ হঠাৎ বেয়াড়া দিকে বেঁকে যেতে পারে এবং কয়েক-ঘণ্টার এদিক ওদিকে হাতের বাইরে চলে যেতে পারে। তাছাড়া কখনও কখনও রহস্য ক'রেও বলা হ'ত যে, শিশুদের রোগে তাড়াতাড়ি না গেলে শিশুটির রোগ হয়ত হঠাৎ আপনা-আপনি ভাল হ'য়ে যেতে পারে। আরও ভয়ের কথা হ'চ্ছে, বেশী দেরী দেখে অনেকেই হয়ত ঘাবড়ে গিয়ে টোটকা ওষধেরই বই প'ড়ে সেরকম কোনও ওষুধ রোগীকে খাইয়ে দিতেন। সুতরাং তার আগেই ডাক্তাররা পৌছতে চেষ্টা করত।

ছোকরা ডাক্তাররা অবশ্য সব কিছুকেই খুব গুরুতর ব'লে ভাবে। তার দু'টো কারণ ছিল; একটা হ'চ্ছে নিজেকে তাড়াতাড়ি সমাজে

সুপ্রতিষ্ঠিত করা ; এবং আর একটা কারণ হ'চ্ছে তার ধারনাই ছিল যে তার কাজে সমাজের ভয়ানক উপকার হ'চ্ছে। অর্থাৎ তার অজ্ঞতা প্রায় রোগীর অজ্ঞতারই সমান। পুরণো ডাক্তার রোগীদের আর্থিক এবং শারীরিক সব খবরই রাখতেন। যদি কোনও বাজে কল্ আসত সেটাকে বুড়ো ডাক্তাররা অদরকারী মনে করতেন—তাহ'লে অন্য জায়গায় কল্ আছে ব'লে তখন সেটা এড়িয়ে যেতেন। আমার প্রথম জীবনের একটা ঘটনা বললেই বুঝতে পারবেন কেন একথা বলছি। একটি ছোকরা হাঁফাতে হাঁফাতে ঘোড়ায় ক'রে আমার কাছে এল—ঘোড়ার মুখ ফেনায় ভ'রে গেছে, পা কাঁপছে, মনে হ'ল যেন প'ড়ে যাবে। ছেলেটির চোখ প্রায় ঠিকরে এসেছে। সে চেঁচিয়ে বললে, "ডাক্তারবাবু শীগগির আসুন—মা'র ভয়ানক অসুখ করেছে।" আমি তাড়াতাড়ি ঘোড়া বার ক'রে তার সঙ্গে গেলাম—এক ঘণ্টারও কম সময় ৭ মাইল রাস্তা—বুঝতেই পারছেন—বেশ তাড়াতাড়িই যেতে হ'য়েছিল। তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর গিয়ে দেখি, একটা উনুনের কাছে জনকয়েক স্ত্রীলোক ব'সে জটলা করছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কার অসুখ করেছে ?" তার মধ্যে এক ভদ্রমহিলা বেশ শান্ত ভাবেই জবাব দিলেন, "আমারই বোধ হয় অসুখ হয়েছে ডাক্তারবাবু ! অসুখ এমন কিছু নয়। তবে অনেক দিন থেকেই শরীরটা ভাল যাচ্ছে না তাই বাবা বলছিলেন যে-ডাক্তারবাবুকে একদিন দেখালে হয় !"

তার চেয়ে আরও দুঃখের ব্যাপার হ'চ্ছে কিছু লোকের অভ্যাস আছে রাত এগারোটার পরে ডাক্তারকে ডাকতে পাঠান। তারপর এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে আবার টেলিফোনের ব্যবহার সুরু হ'তে সেটা আরও বেড়ে গেছে। সাধারণতঃ ব্যাপারটা হ'ত অনেকটা এই ধরনের : একটি শিশু অসুস্থ থাকায় তার বাবা বাড়ী না ফেরা পর্যন্ত তার মা সারাদিন খুব উদ্বেগের মধ্যে দিয়ে কাটালেন। সারাদিন কাজকর্মের

ফলে বাবা ফিরলেন ক্ষুধার্ত অবস্থায়। প্রথমে তিনি স্ত্রীর কথায় ততটা গুরুত্ব দিলেন না। কিন্তু ছেলের ক্রমাগত কান্নায় যখন তাঁর ঘুমে ব্যাঘাত হ'তে লাগল তখন তিনি ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন। এক ভদ্রলোককে জানতাম, তিনি আবার গর্ব্ব ক'রে বলতেন, আমি রাত বারোটার আগে কোনও ডাক্তার ডাকি না তাতে ডাক্তারের রোজগারটা "ভালই হয়।" অবশ্য সে ভদ্রলোক ডাক্তারকে কোনও কালেই ফি দিতেন না, সুতরাং ওটা একটা স্রেফ বাজে চাল ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

ওই ধরনের লোক বা তাদের পরিবারকে আস্তে আস্তে চিনে যেত ডাক্তাররা। এই ধরনের কোনও কল্ এলে তা এড়িয়ে গিয়ে ডাক্তাররা ঐ পাড়া থেকে আর একটা ডাক আসার অপেক্ষা করত। এরকম কল্ এলে যাওয়া-আসার সময়টা বা পরিশ্রমটা বৃথা যাচ্ছে ব'লে আর আফশোষ হ'ত না।

ডাক্তাররা রোগীর পাশে গিয়ে কি করতেন সেটা নোট বই থেকে তুলে দিলেই বুঝতে পারবেন।

সাধারণতঃ রোগীর বাড়ীতে পদার্পণ ক'রে প্রথমেই বুড়োবুড়ীদের নমস্কার আর কুশল প্রশ্নাদি করতে হ'ত। তারপর ছেলেদের খানিকটা পিঠ চাপড়াতে হ'ত। অতঃপর রোগীর কাছে গিয়ে খুব একটা গুরুগম্ভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হ'ত ও দু'একটা হালকা রসিকতা করতে হ'ত। ডাক্তার নাড়ী আর জিভ দেখে কোথায় ব্যথা লাগছে জিজ্ঞেস করতেন। তারপর রোগ সম্পর্কে অভিমত দিতেন ও বাঁধা ওষুধ দিতেন।

প্রায় সমস্ত অভিজ্ঞ ডাক্তারই এই রীতি মেনে চলতেন। আমি কিন্তু আমার নিজের ধারায় চলতাম। রোগী দেখতে গিয়ে আমি বয়স্কা স্ত্রীলোকদের এড়িয়ে চ'লে যেতাম, ছোটদের দিকে তাকাতামও না, সোজা রোগীর কাছে হাজির হতাম। আমি যে এটা উদ্ধতভাবে করতাম তা নয়—রীতিটি আমার ঠিক জানা ছিল না। কিন্তু এর আর একটা

ক্ষতিপূরণের দিকও ছিল। রোগীকে অন্ততঃ আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে পরীক্ষা করতাম। আমার এই খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা রোগীর বেশ পছন্দ হ'ত এবং ক্রমে ক্রমে লোকে বলতে লাগল "ছোকরা ডাক্তারটির আচার ব্যবহার অমায়িক না হ'লেও—বেশ খুঁটিয়ে দেখে।" এই সেদিন আমার এক পুরণো রোগী বললেন যে, তাঁর মনে আছে অনেক দিন আগে তাঁর এক ছোট ছেলেকে নাকি দেখতে গিয়ে তার জামাকাপড় খুলে খুঁটিয়ে পরীক্ষা ক'রেছিলাম। এই পরিবারের লোকজনেরা আমার উপর এত খুসী হয়েছিল যে সেই থেকে চল্লিশ বছর ধ'রে আমি এ পরিবারের সকলের চিকিৎসা করছি। ভাল কথা, সেই সূত্রে মনে পড়ল যে ওই ছেলেটির সে বার প্লুরিসি হ'য়েছিল, আমি ধরতে পেরেছিলাম; অথচ আমার আগের এক ডাক্তার কেবল জিভ দেখে তা ধরতে পারেন নি।

গাঁয়ের ডাক্তারের বেশীর ভাগ ডাকই আসত তুচ্ছ বা অতি সাধারণ রোগের জন্য। গলাব্যথা বা টনসিল বা ঐ ধরনের রোগের জন্য, যা অতি সহজেই ধরা যেত। বুড়ী ঠাকুরমার হয়ত হাঁপানি বা ব্রঙ্কাইটিস বেড়েছে বা কারও বাবার আবার বাতের ব্যথা দেখা দিয়েছে। বাড়ী ঢোকা মাত্র এসব রোগ বুঝতে পারা যেত এবং সাধারণ ওষুধেই কাজ হ'ত। তারপর দু'একদিন বাদে ফিরে গিয়ে দেখলেই হ'ত যে রোগী কেমন আছে।

চামড়া ছিঁড়ে গেলে বিনা দ্বিধায় সেলাই ক'রে দেওয়া হ'ত—আর রোগীর তখন কোনও চেঁচামেচি করা চলত না। যদি হাড় ভেঙ্গে যেত তাহ'লে গোলাবাড়ীর উঠোন থেকে একটা তক্তা-টক্তা যা হোক যোগাড় ক'রে আনা হ'ত। টুকরো কাঠ পাওয়া গেল তো ভালই, না হ'লে কোনও কিছুর সঙ্গে আটকানো কাঠের টুকরো জোর ক'রে খুলে নেওয়া হ'ত। এইবার বিছানার চাদর দিয়ে হাড় বেঁধে দেওয়া হ'ত। এক্স রে তখনও

আবিষ্কৃত হয় নি, কিন্তু গাঁয়ের ডাক্তাররা স্রেফ অভিজ্ঞতার ফলে যে চিকিৎসা করতেন তাতে অত্যাশ্চর্য্য ফল পাওয়া যেত। পা জিনিষটাকে তখন কাজের জিনিষ ব'লেই ধরা হত। কাজেই দেহের কোনও বিকৃত অঙ্গকে যদি কাজের যোগ্য ক'রে তোলা যেত তা'তে প্রত্যেকেই খুসী হ'ত—দেখতে ভাল হোক বা না হোক কিছু এসে যেত না।

যদিও বেশীর ভাগ ডাকই আসত সাধারণ ও ক্ষণস্থায়ী রোগের জন্যে কিন্তু এমন অনেক গুরুতর ও কঠিন রোগ মাঝে মাঝে হাতে আসত—যা অনেক অভিজ্ঞ ডাক্তারেরও মাথা ঘুরিয়ে দিত। সবার উপর ছিল টাইফয়েড জ্বরের মহামারী। যাই হোক, সুখের বিষয় হ'চ্ছে টাইফয়েড নিয়ে ডাক্তারকে যে রকম মাথা ঘামাতে হ'ত, অন্য কোনও রোগে তা হ'ত না। এই টাইফয়েড রোগ গোড়া থেকেই এত অতর্কিতে এমন গতি পরিবর্ত্তন করত যে খুব শিক্ষিত ডাক্তারকেও অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হ'ত। ব্যাপার হ'ত এই যে, জ্বরটা বোঝা না গেলেই ডাক্তাররা বলত "এটা টাইফয়েড"। রোগনির্ণয় ভুল প্রমানিত হ'লে ডাক্তারেরা বলত যে তারা রোগের ধারা বদলে দিয়েছে। এইটাতেই আমার একটু মুস্কিল হ'ল—কিন্তু আমি ওসব মিথ্যে কথা বলতাম না। শেষকালে সবাই বলতে লাগল, "ও ছেলেটা সৎ।"

টাইফয়েড রোগের কয়েকটি বিশেষ অবস্থায় ডাক্তারকে কাজে লাগত। জ্বর খুব বেশী হ'লে আর রোগী ভুল বকতে সুরু করলে ঠাণ্ডা জলে গা মুছিয়ে দিতে হ'ত। তখনকার দিনে অন্ততঃ ডাক্তারদের অভিমত ছিল তাই। তখন বিশেষভাবে শিক্ষিত নার্স না থাকায় ডাক্তারকেই ও কাজ করতে হ'ত। সাধারণতঃ এক ঘণ্টা কি দু'ঘণ্টা ধ'রে গা মুছিয়ে দিলে তবে জ্বর ১০৩° ডিগ্রীতে নামান যেত। তারপর রোগী শান্তিতে ঘুমতে সুরু ক'রলে তখন মনে হ'ত পরিশ্রম সার্থক হ'য়েছে।

এক এক সময় এই রোগের গতি বেশ অদ্ভুত হয়। আমার এক রোগী প্রায় বিশ সপ্তাহ ধ'রে জ্বরে ভুগল। কারও কিছুদিন হয়ত জ্বর হ'য়ে হঠাৎ জ্বর ছেড়ে গেল—আবার হঠাৎ সুরু হয়ে গেল জ্বর। সবচেয়ে আশ্চর্য্য দেখেছিলাম দু'টি ছোকরা জোয়ান চাষার প্রায় একই সঙ্গে জ্বর সুরু হ'য়ে তারপর দশ দিন অবধি দু'জনের ঠিক একই ভাবে জ্বর চলে। দশ দিনের দিন একজনের হঠাৎ ঘাড় বেঁকে ভীষণ মাথার যন্ত্রণা দেখা দিল। আমি সারারাত তার কাছে ব'সে রইলাম—অনেক কিছু করলাম, কিন্তু যন্ত্রণা কমল না। পরের দিন সকালে সে মারা গেল। তখন মেরুদণ্ডে ছিদ্র হওয়ার ব্যাপার কেউ জানত না। যাই হোক, আমি তাড়াতাড়ি অন্য রোগীটির বাড়ী গিয়ে দেখি তার জ্বর নেই, আর সে নিশ্চিত মনে প্রাতরাশ সারছে।

সেই বছর গরমের শেষাশেষি আমার নিজেরই টাইফয়েড হ'ল।

সে বার পরিপাক যন্ত্র সংক্রান্ত অসুখও ভয়ানক দেখা দেয়, বিশেষ ক'রে ছেলেদের মধ্যে। আমি টাইফয়েড রোগের চিকিৎসার অবসরে উক্ত রোগের চিকিৎসাও করছিলাম এবং এই ভাবে নিঃসন্দেহে অনেক শিশুর প্রাণরক্ষা ক'রেছি। তখন বরফ পাওয়া যেত না—স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থারও কেউ বড় ধার ধারত না। তার পরের বছর গরমের সময় বহু শিশু মারা গেল।

কোনও শিশুর তড়কা হ'চ্ছে শুনলেই আমি সবকিছু ফেলে ছুটতাম। হয়ত দেখতাম শিশুর তড়কা হ'চ্ছে, জ্বর ১০৫° ডিগ্রি। হয়ত ক্যাষ্টর অয়েল এবং পিচকারী প্রয়োগ করতাম। তাতেও তড়কা বন্ধ না হ'লে ঈষদুষ্ণ জলে বসিয়ে দেওয়া হ'ত রোগীকে। তড়কা বন্ধ হ'লে স্যালল (Salol) ও বিসমাথ (Bismuth) দিতাম।

গত চল্লিশ বছরের ডাক্তারী শাস্ত্রের ইতিহাস সমালোচনা ক'রে খুসী মনেই বলতে পারি যে শিশুর খাদ্য সংক্রান্ত চিকিৎসায় যা উন্নতি

হ'য়েছে তা আর কিছুতে হয় নি। তরুণ শিশুরোগ বিশেষজ্ঞরা তাঁদের মাস্টার মশাইদের কাছ থেকে আধুনিক চিকিৎসার জ্ঞানলাভ করেছেন। তাঁরা দীর্ঘদিন আগেকার পরীক্ষার কথা কিছুই জানেন না। এখন ঐ সব এত বেশী উন্নত হ'য়েছে যে ঐ ধরণের ভীষণ রোগ আর দেখা যায় না বললেই হয়।

আমি যদি বেশ বড় শিল্পী হতাম এবং যদি কেবল একটিমাত্র ছবি আঁকতে বলা হ'ত—আমি তাহ'লে একটি ছবি আঁকতাম। তাতে দেখা যেত শিশু রোগশয্যায় শুয়ে এবং তার পাশে মা এবং কিছু দূরে তার বাবা হতাশায় মুহ্যমান। কোনও রকম দুর্ঘটনাতে বাবার চেয়ে মা'ই বেশী শক্তভাবে সেটাকে নিতে পারেন। যারা পরিবারের ডাক্তার ও স্ত্রীলোকদের ভাল ক'রে জানে, তারা কেউই স্ত্রীলোকদের অবলা বলবে না।

অপরের প্রাণ বাঁচাবার জন্য আমি বহু বেপরোয়া কাজ করেছি, কিন্তু শিশুদের তড়কা সারাবার জন্য যে সংগ্রাম করেছি, তার স্মৃতি আমাকে যে রকম আনন্দ দেয়; এমন আর কিছুতে নয়। হাত-পায়ের সঙ্কোচন বন্ধ হয়ে সেগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় আসছে, শিশু ধীরে ধীরে বালিশে মাথা তুলছে, তার মা'র চোখে আবার আশার আলো দেখা দিচ্ছে ও ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠছে—এগুলি দেখতে পাওয়ার মত আনন্দের অভিজ্ঞতা জীবনে আর হয় না।

আমি যা বলছি সে সম্বন্ধে আমার নিজের বেশ ভালই অভিজ্ঞতা আছে। আমার নিজের শিশুকন্যার তড়কা চলেছিল বার ঘণ্টা ধ'রে। আমি তার রোগশয্যার পাশে একেবারে অসহায় হয়ে ব'সেছিলাম। একজন সাধারণ লোকের মত আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ ঘুমোবার পর সে উঠে জিজ্ঞেস করলে, "আমার পুতুল কই?" অত মিষ্টি কথা আর কখনও যেন শুনি নি। সেই থেকে আর কোনও

দিন রুগ্ন শিশুর চিকিৎসা করি নি। আজ প্রায় ৩০ বছর পরেও সেই স্মৃতি আমার মজ্জায় শিহরণ বইয়ে দেয়।

অবশ্য পালা করে অনেক ধরনের রোগীই আসত। আমার প্রথম পেটের গোলমালের রোগী আসে এক দম্পতী। দু'জনেরই রোগলক্ষণ একেবারে এক। দুজনকেই এক ওষুধ দিয়ে ঝুঁকি নিতে পারলাম না। তাই একজনকে এ্যাণ্টাসিড এবং আর একজনকে হাইডোক্লোরিক এ্যাসিড দিলাম—দু'জনেই খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠল। তারা ভাবল যে দু'জনের একই রোগ অথচ তার মধ্যে যে একটু তফাৎ আছে সেইটে ধরতে পেরেই ছোকরা ডাক্তার আলাদা ওষুধে দু'জনকেই ভাল ক'রে দিল—আশ্চর্য্য যা হোক! এই দম্পতীর একজন এখনও জীবিত আছে—এবং এই সেদিনও তার সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছিল। তার শরীর এখনও চমৎকার রয়েছে এবং আজ চল্লিশ বছর পরেও সেই ব্যাপারের জন্যে তিনি কৃতজ্ঞ। এই ধরনের অভিজ্ঞতাই অনেক কঠোর শ্রমকে সার্থক ব'লে মনে করিয়ে দেয়। এতে আর একটা জিনিষ বোঝা যায় সেটা হ'চ্ছে খুব তাড়াতাড়ি মনস্থির করার উপকারিতা। আর হ্যাঁ, মনের কথা সবাইকে খুলে না বলার সুবিধাও বোঝা যায় বেশ।

জীবনমরণ সমস্যা না হ'লেও অসুখ সারলেই রোগীরা তার জন্যে কৃতজ্ঞ থাকে। একবার ভীষণ তুষার-বাত্যার মধ্যে দিয়ে রোগীর কাছে পৌঁছে দেখলাম তার কোমরে এক ফোড়া হ'য়েছে। রোগী-টির ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছিল। ফোড়ার মুখটা সামান্য একটু কেটে দিতেই সঙ্গে সঙ্গে রোগীর আরাম বোধ হ'ল। সে ভাবল আমিই তাকে বাঁচিয়েছি। এ রকম পরিস্থিতিতে ঝানু ডাক্তাররা রোগীর ধারণাটা ক্ষুণ্ণ করতে চান না। এই সব ক্ষেত্রে তিনি গম্ভীর এবং বিনয়ী ভাব দেখান, অবশ্য এজন্যে তাঁর লজ্জা করবার কিছুই নেই, কারণ সাধারণ লোকের অনেক নিয়মই তাঁর প্রতি খাটে না। যেমন অনেক

সময় বিশেষ কিছুই না করার জন্যেও তিনি অজস্র প্রশংসা পান, তেমনি আবার অনেক সময় অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু রোধ করতে না পারার জন্যে গালাগাল খেয়ে মরেন। ডাক্তার যে সময়মত এবং সঠিক চিকিৎসাই ক'রেছেন তা কেউ দেখবার দরকার বোধ করেন না।

প্রসব করাতে গিয়ে গাঁয়ের ডাক্তারকে বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হয়। একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলছি। রোগিণীর বয়স প্রায় ৪০ বছর। দেখতে ছোটখাট ও মোটাসোটা। দেখেই বুঝতে পারলাম বেশ শক্ত 'কেস'। কেবলমাত্র তার স্বামী সেখানে ছিলেন। রাতটাও ছিল বেশ ঝোড়ো। যেই আমি পৌঁছলাম—তার নির্বোধ স্বামীটি কোথায় যেন বেরিয়ে চ'লে গেল। সেখানে রোগিণীর কাছে রইলাম আমি একা। একটা ছোট উনুন এবং একঝুড়ি যব প'ড়ে ছিল। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বুঝলাম যে যন্ত্রপাতি দরকার হবে। সংজ্ঞাহীন করার কোনও ওষুধও আমার কাছে ছিল না। রোগিণীর ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল। সে তার স্বামীর চেয়ে সামান্যই বুদ্ধিমতী ছিল। আমি শেষকালে বিছানায় উঠে ভদ্রমহিলার পা দু'টো আমার হাঁটু দিয়ে চেপে ধ'রে ফরসেপ ব্যবহার করলাম। পরিশেষে একটি ফুটফুটে ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'ল। তার পিতামাতার অবস্থা খুব ভাল না হ'লেও ছেলেটি বেশ ভাল ছেলেই হ'য়ে উঠেছে এখন।

একলা প্রসব করানই যে সবচেয়ে ঝঞ্ঝাটের তা নয়। অনেক মা বা শাশুড়ী অনেক সময়ে থেকেও একবারে অকেজো। আমার এবং আমার সহকারীর এক অভিজ্ঞতা থেকেই তা বুঝতে পারবেন। এই কেস্‌টাতেও যন্ত্রপাতির দরকার হয়েছিল। আমার চিন্তা হ'ল রোগিণীর মাকে সেখান থেকে কি ক'রে সরান যায়। যাক্ আমাকে কোনও চিন্তাই করতে হ'ল না কারণ আমার সহকারীটি ভারী বুদ্ধিমান ছিল এবং যে কোনও অবস্থায় কি করতে হয় তা জানত। এক মুহূর্ত

রোগিণীর মা'র দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে তাঁর হৃদ্‌রোগ আছে কিনা। ভদ্রমহিলা আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললেন তা অবশ্য আছে। তখন সহকারী তাঁর বুক পরীক্ষা ক'রে বেশ বিনয়ের সঙ্গে বললে "তাহ'লে আপনার ঘরের বাইরে যাওয়াই বোধ হয় ভাল, কারণ রোগিণীকে সংজ্ঞাহীন করার প্রয়োজন হ'তে পারে।" তিনি ঘরের বাইরেই শুধু গেলেন না—গোলা-বাড়ীর উঠোন পার হয়ে একেবারে বাড়ীর বাইরে মাঠে চ'লে গেলেন। চিকিৎসা শেষ হবার পর তাঁকে আবার ডেকে পাঠান হ'ল।

অনেক অদ্ভুত ক্ষেত্রে ওই সহকারী ডাক্তারটিরই উপস্থিতবুদ্ধি মনে পড়লে এখনও হাসি পায়। যেমন একটা বলি। এক ভদ্রলোককে দেখতে গিয়েছিলাম—তার এক প্রতিবেশী বন্ধুও সেখানে তাকে দেখাশোনা করতেন। কিন্তু বাড়ীর মেয়েরা আমাদের আড়ালে বললেন যে ওই প্রতিবেশী ভদ্রলোক খালি খাওয়ার তালে রান্নাঘরে জাঁকিয়ে বসেন আর সব খাবার খান। একজন মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, ওকে সরানর জন্যে কি কিছুই করা যায় না? আমার সহকারীটি বললেন, তার ব্যবস্থা করা যাবে। খানিক বাদে সহকারীটি রান্নাঘরে গেলেন এবং প্রতিবেশীটিকে সেখানে বসে থাকতে দেখে চমকে ওঠার ভাণ করলেন। বিচলিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি প্রতিবেশীটিকে কাছে আসতে বললেন। রান্নাঘরের এক কোণে দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়াতে ডাক্তার বললেন, "এ যে ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ! এ বাড়ীর খাবার খেলে এ রোগ হবার সম্ভাবনা, জানেন না?" কথাটা অবশ্য বাজে, কিন্তু শুনেই ভদ্রলোকের চোখ কপালে উঠল। তারপর ঘরের চারিদিকে ভয়চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সে সজোরে দরজা খুলেই চোঁ চাঁ দৌড় দিল। শেষবার যখন তার দিকে চোখ পড়ল, দেখা গেল সে দক্ষিণ পূর্ব দিকে সবেগে ছুটছে।

আরও একটা ভারী মজার ব্যাপার হ'য়েছিল একবার। একবার

এক পুরণো লড়াই-ফেরতা বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখতে গিয়েছিলাম। ভদ্রলোকের বুকে বেশ সর্দ্দি জমে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হ'চ্ছে। তাঁকে আগে তাঁর যে পুরণো ডাক্তার দেখছিলেন—পরীক্ষা ক'রে বুঝলাম তাঁর রোগনির্ণয় ঠিকই হ'চ্ছিল। আমি যখন যন্ত্রপাতি ঠিক করছি তাঁর চিকিৎসার জন্যে তখন ভদ্রলোক হঠাৎ বললেন—"জানলেন ডাক্তারবাবু —বুড়ো এ্যাব্রাহাম লিঙ্কনকে দেখেছিলুম ভারী সাধাসিধে লোক, তারপর দেখছি এই আপনি।" তাঁর স্ত্রী রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বললেন—"আঃ তুমি চুপ কর। বুড়ো এ্যাব্রাহাম একবার তোমায় বাঁচিয়েছিল—এই-বার বোধ হয় এই ভদ্রলোকও বাঁচাতে পারবেন।" শুনলাম তখন লড়াইয়ের চৌকিদারীর কাজে একদিন ঘুমিয়ে পড়ায় প্রাণদণ্ডের আদেশ হ'য়েছিল কিন্তু প্রেসিডেন্ট এ্যাব্রাহাম লিঙ্কন তার প্রাণদণ্ডাদেশ মকুব করেছিলেন। যাই হোক, ভদ্রমহিলার ভবিষ্যদ্বাণীই সফল হ'য়েছিল। তিনি তাড়াতাড়ি সেরে উঠলেন। তাঁর পরিবারের সেই ডাক্তারের কাছ থেকে শুনেছিলাম যে, সেই ভদ্রলোক তাঁকে বলেছিলেন আমার সম্বন্ধে, "ওর সম্বন্ধে একথা বলা উচিত হয় নি, কারণ, আমার বোঝা উচিত ছিল যে, ও ভাল না হ'লে ওকেও কেউ না কেউ গুলি ক'রে মেরে ফেলত।" আমার মনে হয় মর্যাদা না হারিয়েও ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারে এই ঘটনাটি একটি চমৎকার উদাহরণ।

এই ত গেল ডাক্তারী প্র্যাকটিসের মোটামুটি ঘটনা। তবে প্রত্যেক ডাক্তারের নিজস্ব মেজাজ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরও এর কিছু অদল-বদল হয়।

লোকের সঙ্গে আচার ব্যবহার অনেকটাই নির্ভর করত ডাক্তারের নিজের বাল্যশিক্ষা এবং জীবন সম্বন্ধে তাঁর মতামতের উপর। আমি যা লিখলাম বা যা লিখিই না কেন আমার অনেক পাদ্রীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল। তাদের সঙ্গে নিজের মতবাদ নিয়ে আলোচনা করতাম।

প্রায় সব পাদ্রীরই ধারণা ছিল যে ঠিক মৃত্যুর সময় একটা উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটবে এবং তাঁরা ভাবতেন আমি তাঁদের আলোচনার খোরাক জোগাব। আমাকে অবশ্য বলতেই হ'ত যে সাধু ও পাপীর মৃত্যু ঠিক একই ভাবে হয়—আগে যাই ঘটে থাক না কেন মৃত্যুর সময় বিশেষ যন্ত্রণা কিছু হয় না। কেবল এক ভদ্রলোককে দেখেছিলাম তিনি মরবার সময় ভয়ানক ভয় পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন গীর্জ্জার একজন ভক্ত এবং ধর্ম্মভাণকারী এক পুরণো পাপী।

আগেকার যুগে আমরা রোগীর মৃত্যুশয্যায় তাদের সঙ্গে থাকতাম। আমরা চেষ্টা করতাম যাতে তার কষ্ট না হয়। এক্ষেত্রে আমাদের নজর থাকত মৃত্যুপথের পথিকের উপর যত না হোক, জীবিতদের উপর বেশী। পুরণো প্রবাদবাক্য "অতি দুঃখে চোখের জল আসে না" এটা সত্য ব'লে আমি সমর্থন করি। শিশু মারা যাওয়ার সময় তার কাছে শিশুর মা ও আমি ব'সে আছি এরকম ঘটনা বহুবার হ'য়েছে। যখন শিশুর ছোট্ট দেহটি শেষবার কেঁপে উঠে স্থির হ'য়ে গেলে আমি ও শিশুর মা পরস্পরের প্রতি চেয়েছি—দু'জনেই বেশ বুঝলাম শিশুটির প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। কারও চোখে জল এল না।

সবচেয়ে দুঃখের ঘটনা চোখে দেখেছি এক বৃদ্ধ দম্পতীর মৃত্যুশয্যায়। এই দম্পতী অনেকদিন একসঙ্গে বাস ক'রেছে। দু'জনেরই নিউমোনিয়া হ'য়েছিল। আমি ব'সে ব'সে দেখলাম বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা মারা গেলেন—তারপর ভদ্রলোককে দেখতে গেলাম। কিন্তু তাঁকে কিছুই বললাম না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন "ও কি মারা গেছে?" আমার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। ভদ্রলোক হাতজোড় ক'রে চোখ বুজলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই মারা গেলেন। এর মানেও কি বুঝিয়ে বলতে হবে? সবচেয়ে চমৎকার দৃশ্য যা দেখেছি তা হ'চ্ছে এই শান্ত বৃদ্ধ দম্পতীর বার্ধক্য। আমার মনে হয় যে, একই জায়গায় একই সময়ে পৌছতে

গেলে একই সঙ্গে ভ্রমণে বেরুতে হয়। এবং এইভাবে যাত্রা করতে গেলে জীবনের সব বোঝা সমানভাগে ভাগ ক'রে নিতে হয়।

আজকাল ডাক্তাররা শেষ সময়ে রোগীর কাছে থাকেন না। থাকলে কিই বা হয়? বিজ্ঞানের দিক দিয়ে কিছুই নয়। কিন্তু মানবতার দিক থেকে অনেক কিছুই হয়। যা বলছি ঠিকই বলছি। আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের সময়—আমার কন্যার মৃত্যুশয্যার একপাশে ছিলেন সদাবিশ্বস্ত নার্স ক্যারি—অন্য পাশে ছিলেন অতুলনীয় ডাক্তার ক্যাম্পবেল। তিনি পুনর্জীবিত করার চেষ্টা ক'রে যাচ্ছিলেন। আমরা দু'জনেই বুঝেছিলাম ওটা মোটেই কার্য্যকরী হবে না। তবুও অকার্য্যকরী হ'লেও এই যে লড়াই, এইটাই মনের মধ্যে একটা অবর্ণনীয় সান্ত্বনা এনে দেয়। আমি জানি আমার জীবনের শেষ মূহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই ঘটনা আমার স্মৃতিপথে জাগরূক থাকবে: কন্যার মৃত্যুশয্যার একদিকে নার্স, অন্যদিকে ডাক্তার। যদিও বিজ্ঞানের দিক থেকে বৃথা চেষ্টা তবুও এই একই ধরনের কোনও পরিস্থিতি আমার উপস্থিতির ফলে যদি কখনও কেউ আমার মতই সান্ত্বনা পায়, তাহ'লে আজ পর্য্যন্ত আমি যা কিছু করেছি, এর দাম তার চেয়ে অনেক বেশী ব'লে মানব। মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট যতদূর সম্ভব লাঘব করাই আমাদের জীবনের ব্রত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ডাক্তারখানায় যে-সব রোগী আসে তাদের বারোমেসে রোগ আছে। এর সঙ্গে প্রায় সব পরিবারই পরিচিত। প্রায় ক্ষেত্রেই সেগুলো হ'চ্ছে অতি তুচ্ছ এবং আপনা থেকেই সেরে যায়। এছাড়া আরও কয়েকটা "হঠাৎ-ধরা-শক্ত" গোছেরও রোগ আছে যা ঠিক বিশেষ কোনও জাতীয়

রোগ নয় কিন্তু প্রায় ডাক্তাররাই সেই রোগগুলিকে চেনেন। সেগুলো সামলানোও ওই একই ব্যাপার কিন্তু আসলে সেগুলো কাছাকাছির ডাক্তারেরই দেখা উচিত। দূরের কন্‌সালটিং ডাক্তারের চেয়ে সেখানকার ডাক্তার ভাল জানেন তাঁর বাড়ীর পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া—এবং এই জানার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে চিকিৎসার ব্যবস্থা। অনেক রোগীর নিজের কতকগুলি বাঁধাধরা অসুখ আছে যেটা তারা বহুদিন পর্য্যন্ত মনের মধ্যে জিইয়ে রাখে। অনেকের আবার রোগটা সম্বন্ধে কিছু দুর্ব্বলতা আছে কারণ আর যাই হোক সেইটা নিয়ে বন্ধুবান্ধব ও পাড়া-পড়শী মহলে খানিকটা আলোচনা করা যায়। যেমন পাড়ার বুড়ো ঠাকুর্দ্দার বাত বাড়লেই তা নিয়ে উপভোগ্য আলোচনা চলতে পারে। কারণ এ থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে বৃষ্টি হ'বে।

সাধারণ ডাক্তারদের ডাক্তারখানা গত পঞ্চাশ বছরে সম্পূর্ণরকম বদলে গেছে। সুতরাং তখনকার পুরণো ডাক্তারের ডাক্তারখানাটা কি রকম ছিল একবার দেখা যাক। সাধারণতঃ দু'টো ঘর থাকত—একটায় রোগী ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা ক'রত, আর একটায় ডাক্তার রোগীর জন্য অপেক্ষা করতেন। আমার প্রথম ডাক্তারখানাটিও এই রকম ছিল। আমার প্রথম বছর রোজগার হ'য়েছিল দুশ'ষোল ডলার—এতেই বুঝবেন যে আমার ডাক্তারখানা ঠিক রোগীর ভিড়ে তখন ভর্ত্তি হয়ে উঠত না। আমার অন্য ঘরটার গালভরা নাম ছিল "কন্‌শালটিং রুম"। এইঘরে একটা টেবিল থাকত বিজ্ঞাপনের কাগজে ভর্ত্তি, কেবল একটা কোণ ছাড়া—সেইটা ডাক্তারের পা তুলে রাখবার জন্যে খালি থাকত। ডাক্তারদের জুতোয় ত' আর অশ্বারোহীর জুতোর মত কাটা থাকত না সুতরাং টেবিলের একটা কোণ কাগজ সরিয়ে পা রাখবার ব্যবস্থা করতে হ'ত নইলে পা পিছলে যাবে। একখানা ভাঙ্গা চেয়ার রাখা ছিল টেবিলের সামনে—এককালে এই চেয়ারটি বেশ আরামদায়কই ছিল।

রোগীদের জন্যে ছিল কয়েকটা চেয়ার এবং দশ ডলার দামের একটা রোগী পরীক্ষা করার টেবিল—এটি ৭৬ ডলার দামে তখনকার ডাক্তারকে কিনতে হ'ত। আমি পৌণে পাঁচ ডলারের কাঠের তক্তা ইত্যাদি কিনে তাই দিয়ে নিজেই টেবিল তৈরী ক'রে নিয়েছিলাম। এছাড়া ছিল যন্ত্রপাতি রাখার একটা টেবিল—সেটা আসলে আর কিছুই নয় রান্নাঘরের একটা টেবিল। ওগুলো এক ডলারেই কিনতে পাওয়া যেত, তবে ওগুলোতে রঙ লাগান থাকত না।

লোক বলতে ডাক্তারই একলা। তাঁরই কাজ ছিল ভদ্রমহিলাদের একটি একটি ক'রে জামা কাপড় খুলতে সাহায্য করা—তারপর পরীক্ষা হ'য়ে গেলে আবার একটি একটি ক'রে জামা পরতে সাহায্য করা। এ ব্যাপার যদি কখনও কেউ দেখে থাকেন তাহ'লেই তিনি বুঝতে পারবেন কেন ডাক্তার নাড়ী আর জিভ ছাড়া আর কিছু পরীক্ষা না ক'রেই সন্তুষ্ট থাকতেন। যখন প্র্যাকটিশ সুরু ক'রি তখন ছ'টি পেটিকোট পরার রেওয়াজ ছিল। এখন হয়ত শুনলে অনেকেই বিশ্বাস করবেন না—কিন্তু সত্যিই বলছি। আমি কতবার শুনেছি তার ইয়ত্তা নেই। তাছাড়া অনেক রোগিণীই এত ভীষণ মেদবহুল বা মোটা যে জামাকাপড় খুলে ফেলা সত্ত্বেও যন্ত্রনাটা যে ঠিক কোথায় তা ওই চর্ব্বিভেদ ক'রে ধরা শক্ত হ'ত। তিনমণী বপুর কোথায় যন্ত্রণা হ'চ্ছে তা খুঁজে বার করার চেয়ে একরাশি খড়ের মধ্যে একটা ছুঁচ খুঁজে বার করা সোজা ব্যাপার অনেক। কোনও সহকারী না থাকলেও রোগিণীদের ইতিবৃত্ত শুনেই বুঝছেন যে তাদের একলা পরীক্ষা করায় ভয়ের কিছুই ছিল না। ছ'টি পেটিকোটওলা রোগিণীর মতলব কখনও খারাপ থাকত না এবং বুঝতেই পারছেন, ডাক্তারকেও প্রলুব্ধ করার মত কিছু ছিল না।

এই ত' হ'চ্ছে ইতিহাস। এখনকার গাঁয়ের ডাক্তারখানা সহরের ডাক্তারখানার মতই সযত্নে সাজান থাকে। এখন কোনও মহিলা

সহকারিণীর অনুপস্থিতিতে কোনও রোগিণীকে কোনও ডাক্তারই পরীক্ষা করবেন না বোধ হয়। অনেকক্ষেত্রে এই মহিলা সহকারিণী অফিস দেখাশোনা করেন এবং টাকাকড়িরও হিসাব রাখেন।

ইন্‌কাম ট্যাক্স কালেক্টরের শুভাগমনের পূর্ব্বে যদি কোনও ডাক্তার জানতে ইচ্ছে করতেন যে মোট কত আছে তাঁর হাতে তাহ'লে তার সোজা উপায় ছিল পকেটের টাকা এবং শোধ না করা বিলগুলি মিলিয়ে বড় অঙ্ক থেকে ছোট অঙ্কটি বাদ দেওয়া। ব্যস্‌, এই ভাবেই ঠিক করতেন তাঁর হাতে বেশী আছে না কম।

যদিও ডাক্তারখানায় যারা সশরীরে আসে, তাদের রোগটা সাধারণতঃ শক্ত হ'ত না। তাই ব'লে ভাববেন না যেন যে গুরুতর পীড়িত রোগীও মাঝে মাঝে ডাক্তারখানায় না আসত। আজকে যে রোগী ডাক্তারখানায় দেখা ক'রে গেল,কাল হয়ত সে আর বিছানা থেকে উঠতে পারছে না। যেমন একটি টাইফয়েড রোগী একদিন আমার ডাক্তারখানায় এসেছিল। তাকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। পর দিনই অধিক রক্তক্ষরণের ফলে সে মারা গেল। আর একটি রোগী উদরা-বরক ঝিল্লীর স্ফীতির চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারখানায় এসেছিল—তার ঠাণ্ডা হাত পা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম যে তার মৃত্যু অতি সন্নিকট। সামান্য যন্ত্রণা থেকেই হয়ত এমন ক্যান্সার হ'তে পারে, যা অস্ত্রোপচারেও সারবে না। এই ধরনের অসুখ দেখেই গাঁয়ের ডাক্তাররা সাধারণতঃ ঘাবড়ে যান।

সাধারণতঃ ডাক্তারখানায় যেসব রোগী আসত, তাদের রোগ অনেকদিনের পুরণো রোগ হ'ত ব'লেই ডাক্তার তার পরীক্ষা ভালভাবে বা যেমন তেমন ভাবে করতে পারতেন। চুলকণা বা হাঁপানি গোছের রোগ খুব খুঁটিয়ে দেখার এমন কিছুই নেই। হয়ত অসুখ সেরে যায়, অথবা কিছু উপশম হয় কিম্বা মোটেই ভাল হয় না।

সৌভাগ্যক্রমে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রোগী আস্তে আস্তে ভাল হয়ে যায়। যদি কিছুই উন্নতি না হয় এবং ডাক্তার ও রোগী দু'জনেই বা দু'জনের যে কোনও একজনেরও যদি ধৈর্য্য শেষ হ'য়ে থাকে তাহ'লে তাকে কোনও ক্লিনিকে অথবা রোগ নির্ণয় করতে পারলে কোনও বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এটা অযত্নের নিদর্শন নয়। রোগটা ধরবার জন্যে গাঁয়ের ডাক্তারকে নিজেকেই সব কিছু চেষ্টা করতে হত। তিনি রোগীর ইতিহাস শুনতেন, —রোগীর দেহ পরীক্ষা করতেন, রক্ত, থুথু ইত্যাদি কিছু পরীক্ষা করবার থাকলে করতেন এবং সবশেষে ওষুধ দিতেন।

ডাক্তারখানায় যে সব রোগী আসে তাদের রোগ ছোটখাট হ'লেও ডাক্তারকে সব সময় সজাগ থাকতে হ'ত কখন ছদ্মবেশে শক্ত রোগ এসে পড়ে। ভাল ক'রে লক্ষণ বোঝা না গেলেও তখনই তাঁকে ধরতে হ'ত যে রোগটা কি। হয়ত সামান্য কাশির পিছনে লুকিয়ে আছে যক্ষ্মা, সামান্য পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগের পিছনে লুকিয়ে আছে পাকস্থলীর ক্যান্সার রোগ।

অবশ্য গাঁয়ের ডাক্তার একেবারে নিঃসহায় ছিলেন না। যদি রোগীর অসুখ সারতে না চায় বা তার কোনও অসুখই না থাকে—তাহলে রোগীকে সহরে বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। বলা চলতে পারে যে পরিবারের ডাক্তারের সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা হচ্ছে বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া দরকার কিনা এবং হ'লে কখন নিতে হবে এটা ঠিক করা এবং বিশেষজ্ঞ ঠিক ক'রে দেওয়া। বিশেষজ্ঞের হাতে যাতে না যেতে হয় তা দেখা ডাক্তারের কর্তব্য, এটা বলার মতন হাস্যজনক বক্তব্য আর কিছুই হ'তে পারে না। তবে তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের হাত থেকে রোগীদের রক্ষা করলে তিনি নিশ্চয় তাদের উপকারই করবেন।

ডাক্তারখানার রোগীদের মধ্যে অনেকেই স্ত্রীলোক। তাদের রোগকে সাধারণতঃ স্ত্রীরোগ বলেই অভিহিত করা হয়। অন্ততঃ সেই রোগ কেবলমাত্র স্ত্রীলোকদেরই হয়।

স্ত্রীরোগ বলতে সাধারণতঃ বোঝান হয় স্ত্রীলোকদের ইন্দ্রিয়-সংক্রান্ত রোগ, কিন্তু মেয়েরা কেবল সেই সব রোগের জন্যেই আসতেন না। পূর্বোক্ত রোগের চিকিৎসকদের বলা হ'ত "গায়নকোলজিষ্ট"। আমার কিন্তু পুরণো উপাধিটাই বেশী ভাল লাগে—"স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ"। এতে ক'রে স্ত্রীরোগ এবং স্ত্রীলোকদের রোগ এই দুটোকে আলাদা ক'রে বোঝা যায়। আমার একবার এই সম্বন্ধে ছেলেদের পড়াবার সুযোগ হয়েছিল। তখন ছেলেদের একটা বর্ণনা দিয়েছিলাম যেটা আমার আজও ভাল লাগে। বর্ণনাটা হচ্ছে এই: স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন সেই দুর্ভাগা ব্যক্তি, যাঁর জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে খৃষ্টীয় নীতি শাস্ত্রের বিধানের সঙ্গে জৈব প্রবৃত্তির সম্পর্কসাধন করতে স্ত্রীলোককে সহায়তা করা।

আমি যখন প্রথম ঘোড়া আর গাড়ী নিয়ে প্র্যাকটিশ সুরু করি তখন খুব গুরুতর কিছু না হ'লে স্ত্রীলোকেরা অসুখের কথা কিছু বলতেন না। তাঁদের আটটি কি বারটি সন্তান হ'ত। কল্পনা করুন বারটি সন্তানের জননীর হিষ্টিরিয়া বা পীড়ার ভাণ করার কথা। মা এবং সব সন্তানরাই সংসারের কাজ কর্ম্ম করতেন। সন্তানোৎপাদন ছাড়াও কাপড়কাচার ক্ষার, কাঁথা সেলাই, রান্নাবান্না সবই মায়েরা করতেন। প্রত্যেকেই এমনকি শিশুরাও বাঁচবার জন্যে কিছু করার সৎ চেষ্টা করত। এদের যদি কেউ ডাক্তারখানায় আসত বুঝতে হ'ত যে তার সত্যিই অসুখ করেছে।

যদিও মেয়েদের অসুখই ছিল বেশী, তবুও পুরুষরাও এক এক সময় কম যেতেন না। পৃথিবীতে যত রকম প্রাণী বাস করে তার মধ্যে

"স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত" লোকই হ'চ্ছে সব চেয়ে সাংঘাতিক। সে প্রায়ই পাকস্থলীর গণ্ডগোলে ভোগে. কিন্তু ঠিক কি গণ্ডগোল তা বোঝা যায় না। তার মুখের ভাবটা যেন অনেকটা নির্বাচনের পর দিন ভোটে হেরে যাওয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখের মত হয়। রোগের ইতিহাস পাওয়া মুস্কিল। "যন্ত্রণাটা কি ছড়িয়ে পড়েছে ?"—জিজ্ঞেস করলে জবাব দেবে "হ্যাঁ নিশ্চয়ই !" এবং সবিস্তারে বোঝাতে বসবে কেমন ক'রে যন্ত্রণাটা মাথার পিছনের দিকে বা কুঁচকির দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এই প্রশ্ন থেকেই সমাধান হয় এবং আস্তে আস্তে তার যৌন অবসাদের ইতিহাস পাওয়া যায়। একবার বলতে সুরু করলে তারপর পেটের রোগের কথা ভুলে যায়। সে পাকস্থলীর অসুখের নাম ক'রে বলতে সুরু করে, কারণ এ রোগটির কথা সকলের সামনে ভদ্রভাবে বলা যায়, কিন্তু নিজে সে ভালভাবেই জানে যে, আসল অসুখ অন্য জায়গায়।

একজন খুব জ্ঞানী ডাক্তারকে জিজ্ঞেস ক'রেছিলাম, "এই ধরনের রোগীদের নিয়ে কি করেন ?" তিনি বলেছিলেন, "অন্য কোনও সহরে এমন কারও কাছে পাঠিয়ে দিই যাকে আমি অপছন্দ করি।"

চিন্তাগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা অনেক সময় পেটের গোলমাল আছে ব'লে জানায়। অনেক লোকের মতন তারও পেটের গোলমালের মূলে কোনও রোগই নেই। এই সব রোগ থেকেই দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা উপলব্ধি করা যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রথমেই এল মেষপালকরা—খুব তাগড়াই চেহারার। শিশুকাল থেকেই এরা শূয়োরের মাংস আর বীন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পরিপাক করেছে, কিন্তু ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিপাক শক্তির গণ্ডগোল দেখা দিল। তারপরই এল টাকাওয়ালা লোকেরা। দেখেই বোঝা যায় কাজ-কারবার বন্ধ। তারপর এল মিল-মালিকেরা। তাদের সঙ্গে আস্তে আস্তে ব্যবসায়ের কথা সুরু করলেই তারা স্বীকার ক'রত যে ব্যবসায়ে মন্দা প'ড়ে ভাবনাচিন্তার

সঙ্গে সঙ্গেই পেটের গোলমাল সুরু হ'য়েছে। স্নায়ু সতেজ রাথার ওষুধ আর কিছু মিষ্টি কথাবার্ত্তাতেই এসব রোগী ভাল থাকে।

অনেক রোগ থাকে যা মোটেই ডাক্তারী শাস্ত্রের মধ্যে পড়ে না। তার উপর যদি শরীরের বিশেষ কোনও অংশের রোগের সংগে সংযুক্ত থাকে তাহ'লে সেই রোগ আরাম হ'লে রোগীর মূল রোগ নিরাময় হয় না। রোগী সার্জেনের কাছে যায়, তারপর তার অস্ত্রচিকিৎসা করা হয়, সে সুস্থ হ'য়ে ফিরে আসে। রোগী আরোগ্যলাভ ক'রেছে ব'লে অস্ত্রচিকিৎসক ধ'রে নেন এবং সেই মত তিনি লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু রোগীর পারিবারিক ডাক্তারের কাছে এ আরোগ্য নয়, কারণ রোগী তার সেই একই রোগ দিয়ে বার বার ফিরে আসে তাঁর কাছে। ওষুধের মহাবিদ্যা আমরা একেই বলি। এতেই বোঝা যায় একে কেন ডাক্তারী প্র্যাকটিশ বা অভ্যাস বলা হয় কারণ ডাক্তার ক্রমাগত অভ্যাস ক'রে জানতে পারেন কোন রোগে অস্ত্রোপচার ক'রে কোনও লাভ নেই।

আমি ঠিক এই জন্যেই সব সময়ে চেষ্টা ক'রেছি রোগীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাথার। নিম্নলিখিত ঘটনার মত ঘটনা আমাকে বেশ আনন্দ দিয়েছিল। একটি মহিলা একটি ছোট ছেলেকে নিয়ে ডাক্তারখানায় ঢুকেই কেঁদে ফেলে বললে—"ডাক্তারবাবু বিলি এইমাত্র পিয়ানোর উপর থেকে প'ড়ে গেছে। দেখুন এর হাতটা ভেঙ্গে গেছে কিনা।" পরীক্ষা ক'রে দেখলাম কিছুই হয় নি। বললাম "ঠিক আছে, কিছুই হয় নি।" এক মিনিট মাত্র সময় লেগেছিল।

কখনও কখনও দু'-একটা হাল্কা ঠাট্টা বা মস্করায় রোগীর অনেক কিছু ভয়-ভাবনা মুহূর্তে দূর ক'রে দেওয়া যায়। একদিন দু'টি ভদ্রমহিলা একটি ছোট ছেলেকে নিয়ে চীৎকার করতে করতে ঢুকলেন আমার এক ভয়ানক রসিক সহকারীর ডাক্তারখানায়। সহকারীটি ডেস্কে পা তুলে দিয়ে ব'সেছিল এবং ওদের দেখেও পা নামাল না।

ছেলের কান্নায় আর ওদের চীৎকারে বুঝলেন যে ছেলেটি একটি পেনি গিলে ফেলেছে। "আঃ চেঁচামেচি থামান" বলতে বলতে সহকারীটি একটি পা নামাল ডেস্ক থেকে। "আপনাদের পয়সা আপনারা ফেরৎ পাবেন। ও ত' খালি আয়কর দেওয়ার ভয়ে পয়সাটা লুকিয়ে রেখেছে"। ব্যস্, সবাই হাসতে সুরু করলেন এবং রোগীর ও পয়সার কথা বেমালুম ভুলে গেল।

এইসব ঘটনা থেকে বুঝতে পারা যায়—অনেক রোগী বেশ বিচক্ষণ পারিবারিক ডাক্তারের হাতে পড়লে ভালই থাকে—সে ডাক্তারের হয়ত খুব নতুন নতুন ওষুধ ও চিকিৎসার সঙ্গে পরিচয় নাও থাকতে পারে। কেবল পরিবারের ডাক্তাররাই জানেন যে বেশীর ভাগ রোগের মূলে শরীরের রোগ নয়। রোগের জন্য যে কষ্ট হয় তা সত্যিই খুব ক্ষণস্থায়ী এবং প্রায়ই যন্ত্রণা থাকে না। কিন্তু মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বহির্ভূত কোনও পরিস্থিতির জন্যই হোক বা বাইরে থেকে চাপানোর ফলেই হোক, দুঃখ-শোকের যে কষ্ট, তা চিরকালের। বাইরে এর প্রকাশ থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে, কিন্তু এ সত্য। পরিবারের পুরণো চিকিৎসকের মৃত্যুতে এই সমস্ত রোগী তাদের সব চেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ও প্রধান ত্রাণকর্তার বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চিকিৎসা বিজ্ঞানে আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট শ্রেণীর পড়াশুনা খুবই প্রয়োজন, অবশ্য জ্ঞানের অন্যান্য শাখা সম্বন্ধেও ঐ এক কথাই খাটে। আমরা মূল বিজ্ঞান সম্বন্ধে খুবই আলাপ-আলোচনা করি কিন্তু কোনও ছাত্র ঐগুলি অধ্যয়ন করে' শেষ করার পর কি করবে তা আর তা'কে

বলে দিই না। ছাত্রাবস্থায় সে যা শেখে, তা হচ্ছে মূল বিজ্ঞানের ভূমিকা মাত্র ; সেইজন্ত সে অত অল্প জ্ঞান নিয়ে তুষ্ট হ'তে পারে না। এবং যদি সে তার ঐ প্রাথমিক জ্ঞান কোনও কাজে লাগাতে চায় তাহ'লে উপাধি পরীক্ষার পর ঐ বিষয় নিয়ে তাকে পড়াশুনা করতে হবে। তার ছাত্রাবস্থার সুরু থেকে বার্দ্ধক্য আসা পর্য্যন্ত ঔষধবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অধ্যয়ন তার চিত্ত অধিকার ক'রে রাখে। যদিও ঔষধবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনতে পাই কিন্তু ওর যথার্থ প্রয়োগ খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আরও বেশী জ্ঞানলাভ করতে হ'লে তরুণ চিকিৎসককে অতি অবশ্য উপাধি পরীক্ষার পড়া পড়তে হবে। আমি মনে মনে এই ইচ্ছাই পোষণ করতাম যে আমার চিকিৎসা বিদ্যাসম্বন্ধীয় পাঠ শেষ করবার পর উপাধি পরীক্ষার পড়া কয়েক বছর ধ'রে পড়ব এবং তারপর রোগী দেখতে সুরু করবার পরও ঐ বিষয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যাব। তাহ'লে আমার মনোমত বিষয়ের মৌলিক শাখাগুলিতে জ্ঞানার্জ্জন করতে হ'লে ঐ বিষয়ের পাঠ্যতালিকা পূর্ণাঙ্গ হওয়া প্রয়োজন। আমার মনের এই ইচ্ছা ফলবতী হয় নি—আর্থিক অসাচ্ছল্যের জন্য আমাকে সাধারণ রোগী দেখার কাজে কঠোর পরিশ্রম করতে হ'ত এবং কয়েক বছরের জন্য আমার ঐ উদ্দেশ্য স্থগিত রাখতে হয়েছিল।

আমি যখন মেডিক্যাল স্কুলে পড়ি তখন একজন অধ্যাপকের কাছে শুনি যে জার্ম্মাণীতে পড়াশুনার যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধে আছে। ঐ কথা শুনে আমি মনস্থির ক'রে ফেলি যে, আমার তিরিশ বছর বয়স হ'বার আগেই আমি দু'বছর ঐখানে পড়াশুনা করব। আমার মনে হ'ল যে, যদি আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষার জন্য তৈরী হ'তে হয় তাহ'লে প্রাণীবিদ্যা সম্বন্ধে আমার জ্ঞানলাভ করা খুবই প্রয়োজন, কেননা আমার পড়াশুনা আরম্ভের প্রথম দিকে পুরণো নিয়ম অনুযায়ী বেশীর ভাগ সময়েই অঙ্কশাস্ত্র এবং প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যগ্রন্থ নিয়ে

পড়াশুনা করি, প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই পড়াশুনা করি নি। আমি প্র্যাকটিস্ সুরু করবার পর আমার শিক্ষার এই ত্রুটী সংশোধন করতে চেষ্টা করি এবং সেই জন্য চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের সাহায্যে শিক্ষালাভের যে ব্যবস্থা আছে তার সুযোগ নিতে সুরু করি। সেই সময়ে বহু কলেজেই নানান বিষয়ে চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এখনও প্রথম শ্রেণীর অনেক-গুলি বিশ্ববিদ্যালয়ই যে-সব ছাত্র কলেজে থেকে পড়াশুনা করতে পারে না তাদের সাহায্য করতে চায়—অবশ্য এইভাবে পড়াশুনা করলে ডিগ্রী পাওয়া যায় না।

চিঠিপত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করার যে প্রচেষ্টা আমি করি তাতে আমার মুখ্য বিষয় ছিল প্রাণীতত্ত্ব এবং গৌণ বিষয় ছিল মনস্তত্ত্ব। প্রাণীতত্ত্ব বিষয় পড়বার সময় বেশ কয়েকটি প্রজাপতি সংগ্রহ ক'রে রাখার প্রয়োজন হ'ত। সময় বাঁচাবার জন্য আমি আমার ছাতির ডগায় একটি জাল এবং টুপি দিয়ে তৈরী প্রজাপতি ধরবার কল আটকে রাখতাম। আমি যে জালটি নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম সেটি আমার জামার নীচে ভাঁজ করে রাখতাম। আমার কাজে লাগবে এমন কোনও প্রজাপতি দেখতে পেলে আমি আমার ঘোড়াটি একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখতাম, আমার ছাতির ডগায় জালটি আটকে নিতাম এবং প্রজাপতিদের পিছনে পিছনে ছুটতাম। প্রজাপতি ধরে'ই ওকে Cyanide-এর বোতলের মধ্যে পুরে রাখতাম তারপর জালটি আবার জামার তলায় যথাস্থানে রেখে দিতাম এবং আমার সম্মান আদৌ ক্ষুণ্ণ হতে না দিয়ে বাকী রোগীদের দেখতে যেতাম।

আমার রোগী দেখতে যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে যে সময় মিলত সেই সময়ে চার বছর যাবৎ আমি এই বিষয়ে পড়াশুনা করি। যতদূর সম্ভব আমি আমার রোগীদের কাছ থেকে আমার ঐ বিষয়ে গবেষণার কাজটি

লুকিয়ে রাখতাম। আমার ভয় হ'ত এই ভেবে যে ওরা যদি জানতে পারে কি ভাবে আমি সময় কাটাই তাহ'লে হয়ত মনে করত আমি অতি তুচ্ছ বিষয়ের জন্য আমার সময় নষ্ট করছি। একদিন হল কি, আমি একটি ছারপোকা অনবধানতাবশতঃ ফেলে যাই। একটি বুড়ো গোছের চাষা এসে বলে বসল: "আঃ, ডোরি-ফোরা ডিসেমলিনিয়েটা"—এই ভাবে কি রোগে আমি ভুগছি তা লক্ষণ মিলিয়ে যেন নির্ণয় করল।

শীঘ্রই আমি বুঝতে পারলাম যে আমার গবেষণার প্রতি তারা সন্দিগ্ধ ভাবে দেখত না, আমার গবেষণা দেখে ওরা কৌতুক অনুভব করত: কেউ কেউ আমার গবেষণা কেমন চলছে জানবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করত। ওরা কি রকম কৌতূহল প্রকাশ করত তার উদাহরণ দিচ্ছি—আমি দেহের অন্ত্রের অ্যানাস্টোমসের বিষয়ে গবেষণার জন্য একটি নরম টুকরো নিয়ে কাজ করছিলাম। আমি আমার কুকুরটির উপর অস্ত্রোপচার করবার পর একটি পলস্তারার (plaster) খাপের মধ্যে ওর সামনে থেকে পিছনের পা পর্য্যন্ত বেশ শক্ত করে বেঁধে রেখেছিলাম। ওদের মধ্যে একটি কুকুর হাসপাতাল থেকে পালিয়ে সহরে এসে পড়েছিল, যেন সহর পরিদর্শন করার জন্য পর্য্যটনে বেরিয়েছে। আমার ত' রীতিমত ভয় হ'ল এই ভেবে যে লোকে তাহ'লে জানতে পারবে যে আমি কুকুরদের উপরও অস্ত্রোপচার করি। যে খাপের কথা একটু আগেই বলেছি সেটা কুকুরদের মনোহরণ করার পক্ষে একটু বেয়াড়া ধরনের, কিন্তু লোকেরা আমার এই ধরনের কার্য্যকলাপের জন্য আমার উপর বিরক্তি প্রকাশ না ক'রে প্রচুর হাসাহাসি করল দেখে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। এর কিছুদিন পরে একটি ছোকরার অন্ত্রে গুলীবিদ্ধ হওয়ার দরুণ তার চিকিৎসা করার জন্য ডাক পড়ে—ও ছোকরাটির এক বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটির ফলে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। অস্ত্রোপচার করবার পর রোগীটি শীঘ্রই সেরে ওঠে। আমাদের সহরের

উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ আমার এই আবিষ্কারের ফল দেখে গর্ব্ব বোধ করলেন, কেননা তিনি আমার গবেষণা চালিয়ে যাবার জন্য বহু উপাদানও সংগ্রহ ক'রে দিয়েছিলেন। ইনি গবেষণা করবার জন্য আমাকে কুকুর যোগাড় করে দিতেন। আমার এই সাফল্যের জন্য বেশীর ভাগ সম্মানই তাঁর প্রাপ্য, কেননা তাঁর সহযোগীতা ছাড়া আমার গবেষণা চালিয়ে যাওয়াই সম্ভব হ'ত না।

কেন সঠিক বলতে পারব না—তবে আমার মনে হয় শারীরবিদ্যা পড়বার সুযোগ অল্পবয়স্কীরাও পেত। অবশ্য যখন ছোট ছিলাম তখন আমার নিজের সম্বন্ধে এই ধারণা ছিল যে বড় হ'য়ে হয়ত আমি একজন দার্শনিক হব—কিন্তু কালে প্রমাণ হল যে আমার ছোট বয়েসের ঐ ধারণা নিতান্তই কাল্পনিক। যাই হোক, চিঠিপত্রের আদান-প্রদান মারফৎ একজন জ্ঞানবানের নির্দ্দেশমত মনস্তত্ত্ব বিষয়ে পড়াশুনা করবার এই সুযোগটি পেয়ে সুখী হলাম। আমাদের পাঠ্যপুস্তকগুলি ছিল Ladd, Mundt এর Caldewood-এর লেখা। ওর মধ্যে প্রধান পাঠ্যপুস্তক ছিল Ladd-এর Physiological Psychology নামক পুস্তকখানি। অন্য পুস্তকগুলি অত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না,—তবে ওগুলোও পড়তে হ'ত। আমি বেশ ভালভাবেই পড়ছিলাম কেবলমাত্র Presntation of sense পরিচ্ছেদটি ছাড়া। ওটি যেন এক রহস্যময় ব্যাপার। মনে হ'ত ওর যেন কোনই অর্থ হয় না। ঐ পরিচ্ছেদের আগাগোড়া আমি মুখস্থ ক'রে ফেলেছিলাম—কিন্তু ঐ সম্বন্ধে মগজে কোনও স্পষ্ট ধারণা জন্মাল না। এক অন্ধকার রাত্রে একটি রোগী দেখে ফেরবার পথে অসাবধানতা-বশতঃ একটি খানার মধ্যে পড়ে যাই। খানার উল্টো কিনারায় আমার মাথায় একটা চোট লাগে এবং ঐ সংঘাতের ফলে তারার আলোকে এক নিমেষের মধ্যেই ঐ পরিচ্ছেদের সমস্ত অর্থ আমার কাছে স্বচ্ছ হ'য়ে গেল। পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল যে মনস্তত্ত্ব বুঝতে হ'লে মাথায় ভীষণ-

ভাবে চোট খাওয়া প্রয়োজন, আমার বর্ত্তমান অভিজ্ঞতা ঐ ধারণাকে বদ্ধমূল করল।

বিদেশে লেখাপড়া শেখার জন্ম যে আশা আমি পোষণ করতাম সেই অনুপাতে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্ম ফরাসী ভাষা পড়তে শিখলাম বগী-গাড়ী চড়ে ভ্রমণ করার সময়ে। এখানে একটা কথা বলে রাখি ঐভাবে যা শিখলাম তা হচ্ছে ঐ ভাষা থেকে ভাষান্তরে অনুবাদ করবার জ্ঞান, ঐ ভাষা পড়বার জ্ঞান নয়। ও দু'টোর মধ্যে বিরাট ব্যবধান। শৈশবে আমি জার্ম্মান ভাষাই প্রথম শিখি—এবং বরাবরই আমি ঐ ভাষার কথোপকথন বেশ বুঝতে পারতাম এবং যখন শোনবার ইচ্ছে হ'ত ঐ ভাষায় হিতোপদেশও শুনে বেশ বুঝতে পারতাম। জার্ম্মাণ ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞান বুঝতে পারা খুবই প্রয়োজন এই বোধটি জাগার ফলে আমি চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটি সাপ্তাহিকের গ্রাহক হই এবং দেহের মধ্যে শিরা এবং স্নায়ুর অবস্থান সন্ধন্ধে (জার্ম্মাণ ভাষায়) লিখিত একটি বই ইংরিজী ভাষায় অনুবাদ করি। এই কাজটি খুবই শক্ত ছিল সেই জন্ম ফলও খুব ভাল হয় নি।

চার বছর রোগী দেখার পর যে পরিমাণ অর্থ আমি সঞ্চয় করি, আমি তখনই বুঝেছিলাম যে ওটা নিতান্তই সামান্য, কিন্তু যা করবার তখনই তা না করলে ভবিষ্যতে আর কোনও দিনই করা যাবে কি না সেই সন্দেহ ছিল। আমার বেশ মনে হয়েছিল বিদেশ ভ্রমণের যে তোড়জোড় এবং ব্যবস্থা করেছিলাম তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর—কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে আমি এ কথাই বলব যে মানুষ ঐ ধরনের চিন্তার হাত থেকে কখনই রেহাই পেতে পারে না। কতটা সাফল্য লাভ করেছি তার হিসেব-নিকেশ করছি না, তবে এটুকু বলব যে শেষ দিকে হতাশায় সমস্ত চিত্ত ভ'রে উঠেছিল।

সপরিবারে বার্লিনে পৌঁছবার পর ঐখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম

এবং আমি যে বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করতে চাই সেই বিষয়ের ছাত্রছাত্রী-দের খাতায় নাম লেখালাম। এই খাতায় নাম লেখানর ব্যাপারটি খুবই সহজ। কিন্তু নিজের ছেলেমেয়ের নাম রেজিষ্ট্রী করতে আমার বেশ কয়েক দিন লেগেছিল। একটু ব্যাখ্যা ক'রে বলি : নাম রেজিষ্ট্রী করার সঙ্গে সঙ্গে Passport জমা দিয়ে দিতে হয় এবং ওর বিনিময়ে পাওয়া যায় "ছাত্র-কার্ড"। আমি আমার "ছাত্র-কার্ড" সংগ্রহ করার পর সব চাইতে নিকটবর্ত্তী নাম রেজিষ্ট্রী করার অফিসে যাই এবং পরিবারের সকলের নাম রেজিষ্ট্রী করি। ওঁরা আমার ছাত্র-কার্ড গ্রহণ করতে রাজী হলেন না এবং আমাকে Passport দেখাবার জন্য বললেন। তখন আমি ছুটলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সেক্রেটারীকে আমার বিপদের কথা জানালাম। সেক্রেটারী ত' চ'টে আগুন হ'লেন এবং চেঁচাতে সুরু করলেন। তিনি মাথামোটা পুলিশ অফিসারদের সম্বন্ধে জার্ম্মাণ ভাষায় এক টিপ্পনী কাটলেন। তার পর একটু হেসে বললেন, " 'আপনি আবার শয়তানের কাছে ফিরে যেতে পারেন' এই কথাগুলি অ্যামেরিকাতে কি'ভাবে বলবেন?" এর পর আমি থানায় ফিরে গেলাম এবং সেক্রেটারীর বার্ত্তাটি দু'টো ভাষাতেই বললাম। আমাকে এত হায়রাণ করার জন্য পুলিশ অফিসারটি খুবই বিনীত হ'য়ে ক্ষমা চাইলেন। আমার যে Passport ছিল এই বিষয়ে তিনি দৃঢ়নিশ্চিত হ'তে চেয়েছিলেন।

নাম রেজিষ্ট্রী করবার পর আমি উদরাবরক ঝিল্লী সম্পর্কে অধ্যয়ন করবার সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। ঐ উদ্দেশ্যে যথেষ্ট সঙ্কিত চিত্তে আমি Dr. Hans Virchow-এর সঙ্গে দেখা করলাম। আমি যখন ওঁকে প্রশ্ন করলাম যে উদরাবরক ঝিল্লীর উপর আমি গবেষণা করতে পারি কি না তার উত্তরে তিনি জানালেন যে এই ঝিল্লীর গঠনসম্বন্ধে কেউই বিশেষ কিছু জানতেন না—তবে যেহেতু আমি ঐ বিষয় নিয়ে গবেষণা করার

জন্য আগ্রহান্বিত, তিনি তাঁর সাধ্যমত আমাকে ঐ বিষয়ে নির্দ্দেশ দিতে পারলে সুখী হবেন। পরিশেষে তিনি বললেন: এখন সব চাইতে প্রয়োজন এমন একজনকে যিনি অন্তত বিশ বছর ধ'রে উদর সম্বন্ধে গবেষণা করবেন এবং তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল লিপিবদ্ধ ক'রে রাখবেন। আমি তাঁর অধীনে ছ'বছর ধ'রে গবেষণা করলাম এবং তার পর থেকে নিজেই আজ পর্য্যন্ত গবেষণা চালিয়ে এসেছি।

আমি যতাদন ওখানে গবেষণা করতাম উনি বরাবরই আমার প্রতি খুবই সদয় ব্যবহার করেছিলেন, সে কথা আজও ভাবলে আশ্চর্য্য হই। আমার মনে হত তিনি যেন সব সময়েই কিসে আমার ভাল হয় সেই চিন্তাই করতেন। আমি যে কাজ করতাম সে সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা করার ক্ষমতা তাঁর ছিল, কিন্তু তিনি সব সময়েই আমাকে উৎসাহ দিতেন। যখনই আমি কোনও একটি বিষয় নিয়ে তর্ক তুলতাম তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলতেন: "হুঁ, ঠিকই বলেছ, তোমার কথাই ঠিক বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু অন্যজনে ঐ সম্বন্ধে বিপরীত যুক্তি কি দিতে পারে বলতে পার?" দৃষ্টান্তস্বরূপ. তথাকথিত স্টোমাটাগুলি দিয়েই উদরাবরক ঝিল্লী গঠিত ব'লে যে সর্বজনীন বিশ্বাস রয়েছে. আমি আবিষ্কার করলাম তা ঠিক নয়। আমি ইচ্ছামত তাদের গড়তে বা ভাঙ্গতে পারতাম না। তখনও পর্য্যন্ত তিনি ছেলেমানুষি ক'রে নিজের সন্দিগ্ধচিত্ততা প্রকাশ করে-ছিলেন। তারপর আমি শিখলাম কেমন করে একটি পরিষ্কার কাচের শ্লাইডের উপর সিলভার নাইট্রেটের সঙ্গে ডিমের সাদা অংশটি একত্রে মিশিয়ে ওটা সৃষ্টি করতে হয়। তখন তিনি স্বীকার করলেন যে ঐ সম্বন্ধে যে-কোনও যুক্তির প্রমাণস্বরূপ উত্তর হবে আমার ঐ আবিষ্কার। বিজ্ঞানের পাঠ্য পুস্তক থেকে তথাকথিত Stomataর কথা নির্লুপ্ত হয়ে গেছে।

তিনি প্রায়ই ঐ সম্বন্ধে গবেষণার পুস্তিকা বা আসল গ্রন্থ থেকে পুর্ণ-

মুদ্রিত পুস্তিকাগুলি আমার ডেস্কের উপর রেখে যেতেন এবং আরও নানা উপায়ে আমাকে উৎসাহ দেবার জন্য তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করতেন। তাঁর ছেলেপুলে ছিল না, কাজেই সে সময় আমিই তাঁর ছেলের স্থান গ্রহণ করেছিলাম। আমার বাড়ীর শেষ দিকে আমার যে বন্ধুটি বাস করতেন তাঁকে তিনি একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন যে, আর কাউকে আমার মত এমন অক্লান্ত এবং কঠোর পরিশ্রম করতে তিনি দেখেন নি। আমার সহ্যশক্তি আমার কাছে গর্ব্বের বিষয় ছিল: এ ছাড়া গর্ব্ব করবার মত আমার আর কোনও গুণই ছিল না। আমার দুঃখ হয় যে আমার Arbeit সম্বন্ধীয় গবেষণা আমি জার্ম্মাণ ভাষাতে প্রকাশ করতে পারি নি। তখন আমি বুঝতে পারিনি ঐটি জার্ম্মাণভাষায় প্রকাশিত দেখবার জন্য তিনি কত আগ্রহান্বিত ছিলেন। তিনি বহুভাবে আমার উপকার করেছিলেন—আমার ঐ কাজটি তার সামান্য প্রতিদান হিসাবে গণ্য করা যেত। অবিরাম তিনি এই সতর্কবাণীই উচ্চারণ করতেন—"এ কি সত্য ?"—তাঁর সেই সতর্কবাণী আজও আমার মনে রয়েছে।

আমি বাড়ী ফিরে আসবার পর আবার Peritoneum বা উদরাবরক ঝিল্লী নিয়ে পড়াশুনা সুরু করি। যখন আমি দিনের বেলায় কলেজে অধ্যাপনা করতাম তখন আমি ঐ বিষয়ে পরীক্ষামূলক অনেক গবেষণা করি। যখন আমার রোগী দেখার কাজ বেড়ে গেল তখন আমি জীবিত প্রাণীর মধ্যে Peritoneum-এর রোগ নিদান তত্ত্ব নিয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পেলাম। সুদীর্ঘ বিশ বছর কেটে যাবার পর আমি আমার বৃদ্ধ অধ্যাপকের উপদেশ পালন করতে সমর্থ হলাম এবং তার ফলে আমার লেখা "The Peritoneum" দুই খণ্ডে প্রকাশিত হ'ল। যদিও শুভদর্শী অধ্যাপকের ভবিষ্যৎ বাণী সম্পূর্ণ সফল হয় নি তথাপি ঐ বিষয় নিয়ে কাজ করার সময় আমি রীতিমত রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলাম।

আমার মনোগত ইচ্ছা ছিল অ্যানাটমি নিয়ে গবেষণা করা, সেই জন্য আমি দু'বছর যাবৎ দৈনিক দু'ঘণ্টা ধ'রে, অধ্যাপক Waldeyer-এর বক্তৃতা শুনি এবং হাতে কলমে কাজ করতে দেখি। অ্যানাটমির সব চাইতে নামকরা অধ্যাপক হিসাবে অধ্যাপক Henleর পরেই অধ্যাপক Waldeyer খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি দেহের গঠনের ছবি বোর্ডের ওপর এঁকে দেখাতেন এবং তাঁর বক্তৃতায় ঐ নিয়ে আলোচনা করার সময় মানুষের একটি মৃতদেহ নিয়ে বিষয়টি বিশদভাবে বুঝিয়ে দিতেন। শবব্যবচ্ছেদ ক'রে পরীক্ষা করবার ঘরে তাঁর সঙ্গে আমাদের রীতিমত তর্ক করতে হ'ত। তিনি কেবলই বলতেন ছাত্রদের ত্রি-মাত্রিক অ্যানাটমি সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়াবার খুবই প্রয়োজন, কেননা চিন্তা ক'রে স্মৃতির মধ্যে ধ'রে না রেখে বা কষ্ট ক'রে নানান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম না মনে রেখে যাতে ওদের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের কাঠামোগত যোগাযোগ মনশ্চক্ষুতে স্পষ্ট ধরা পড়ে সেই চেষ্টাই ক'রতে হ'বে। তিনি এই কথাই বলতেন যে যদি অস্ত্রচিকিৎসক এমন সুষ্ঠুভাবে শারীরসংস্থান বিদ্যা না জানতেন তাহ'লে প্রতিবারই রোগীর দেহের উপর অস্ত্রোপচারের পর ভাবতেন এর পর কি করবেন। এটা নিছক সত্য কথা : ঐ দোষের জন্যই অস্ত্রোপচার শেষ করতে বেশ সময় লাগে এবং তার ফলেই সংক্রামক বিষ শরীরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে পড়ে। একবার আমি একজন বিচক্ষণ অস্ত্রচিকিৎসককে পনের মিনিট ধরে একটি caecum অপসারণ করতে দেখি। আমি প্রায়ই এই ভেবে আশ্চর্য্য হতাম, হয়ত তিনি ভেবেছিলেন aortaরই কোনও শাখা বোধ হয় ওর পাশে রয়েছে।

বার্লিনে শরীরের গঠন সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হ'লে ঐ বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার উপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়ার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ব্যবহারিক ঔষধ শাস্ত্রে যে সমস্ত জিনিষের উপকারিতা দেখা যেত না সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হ'ত। উদাহরণ হিসেবে

বলছি—আমি খুব সাবধানতার সঙ্গে একটি হাতের স্নায়ুর উপর অস্ত্রোপচার করি এবং প্রতিটি শিরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্য্যবেক্ষণ করি। আমি কাজটি বেশ সুষ্ঠুভাবেই করি এবং অধ্যাপক Waldeyer এসে পরিদর্শন করবেন ব'লে একটুও চঞ্চল হই নি। তিনি নিজের হাতখানি নেড়ে গর্জ্জে উঠলেন এবং জার্ম্মাণ ভাষায় বললেন: "In allen Himmeln, weg damit"—ওর অর্থ হচ্ছে আমি যে টিকা আবিষ্কার করি তারই অনুরূপ। তারপর তিনি বুঝিয়ে বললেন যে, অতি সূক্ষ্ম শিরাগুলি অস্ত্রচিকিৎসকের কাছে একেবারে নিরর্থক, কারণ এরা শরীরগঠনের প্রয়োজনীয় অংশগুলি ভালভাবে প্রকাশ করার পথে বাধা সৃষ্টি করতো।

প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ে আমি পড়াশুনা করা ছাড়াও বার্লিনের অনেক হাসপাতাল পরিদর্শন করে বেড়াই। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমস্ত বিষয়েই আমি পর্য্যবেক্ষণ করি কেবলমাত্র চোখের অসুখ ছাড়া। গোড়া থেকেই আমি স্থির করেছিলাম যে ঔষধ বিজ্ঞান সংক্রান্ত সব কিছুই শিখব এবং এ ছাড়াও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ইতিহাস পড়বারও খুব ইচ্ছা ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলছি, যখন আমি সাধারণ রোগের চিকিৎসা করি, কিভাবে চশমার কাচ লাগাতে হয় তাও শিখে নিয়েছিলাম। এই বিষয়ের জ্ঞান কখনও কখনও কাজে লাগত, যদিও অস্ত্রচিকিৎসার সঙ্গে এর কোনই সম্বন্ধ নেই। যখন দেখা যেত, কোনও সুন্দরী রমণী অতি সাধারণ কাচের চশমা চোখে দিয়ে বেশ উপকার হচ্ছে ভেবে পরম নিশ্চিন্তে আছে তখন এটা বেশ বোঝা যেত তার উপর আর অস্ত্রোপচার করার প্রয়োজন নেই। এ ছাড়াও আমি যখন সাধারণ রোগের চিকিৎসা করতাম তখন নাক এবং গলা সম্বন্ধেও আমার সাধ্যমত পড়াশুনা করতাম; বাস্তবিক পক্ষে তখন নাক এবং গলা সংক্রান্ত যতগুলি অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল তার সবগুলিই আমি করেছিলাম।

নাক এবং গলার কথা যখন উঠল তখন এই সূত্রে একটি ঘটনার

কথা আমার মনে আসছে। আমার বন্ধু এবং আমি দু'জনেই নাক এবং গলা সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষালাভ করব ব'লে খ্যাতনামা অধ্যাপক Janzen-এর ক্লাসে নাম লেখালাম—শুধু এই ভেবেই ঐ রকম করলাম যে, আমাদের দু'জনেরই ধারণা ছিল যে অস্ত্রচিকিৎসকের সব রকম অস্ত্রোপচারই জানা দরকার। মোট ছেচল্লিশ জন ছাত্র খাতায় নাম লিখিয়েছিল তাদের মধ্যে সকলেরই বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল ঐ বিষয়ে কেবলমাত্র আমার এবং আমার বন্ধুর ছাড়া। পালা ক'রে ক'রে ছাত্ররা অস্ত্রোপচার করত। Janzen একটি বিশেষ ধরনে অস্ত্রোপচার করতেন, ক্রমে ক্রমে ঐ পূর্বোক্ত বিশেষ অভিজ্ঞরা পাশ করতে পারল না। আমাদের মাথায় একটি চমৎকার বুদ্ধি এল। আমরা Janzen-এর এক সেট অপারেশান করার যন্ত্রপাতি যোগাড় করলাম, এবং ঘুষ দিয়ে যে ঘরে মৃতদেহ রাখা হ'ত তার মধ্যে ঢুকলাম এবং মৃতদেহের উপর অস্ত্রোপচার ক'রে ক'রে ঐ বিষয়ে হাত পাকালাম। আমরা বহুশত মৃতদেহের ওপর অস্ত্রোপচার ক'রে ক'রে ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে পড়লাম। যখন আমাদের পালা এল জীবন্তদের উপর অস্ত্রোপচার করবার তখন আমরা বিনা দ্বিধায় তা সমাধা করলাম এবং দু'হাত দিয়েই কাজ করলাম, ধন্য অধ্যাপক Janzen! আমরা যতক্ষণ কাজ করছিলাম ততক্ষণ অধ্যাপক নিবিষ্টচিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করলেন তারপর জোর গলায় চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন: "এরা গলার চিকিৎসায় জন্মবিশেষজ্ঞ"! তারপর আমাদের অনুরোধ ক'রে বললেন আমরা যেন সাধারণ অস্ত্রচিকিৎসা না ক'রে নাক এবং গলা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হই। অবশ্য আমরাও কাউকে খুলে বলি নি কিভাবে আমরা এমন পারদর্শিতা লাভ করলাম। আমাদের চুপচাপ থাকবার আসল কারণ ছিল অবশ্য মৃতদেহের ঘর যিনি রক্ষণাবেক্ষণ করতেন তাঁর সঙ্গে এই মর্ম্মেই আমাদের একটা চুক্তি হয়েছিল।

আমি এক বছরেরও বেশী সময় দৈনিক দু'ঘণ্টা কি তার চাইতেও বেশী সময় বার্লিনের একজন সব চাইতে সেরা রোগনির্ণয়কারী Brandenburg-এর সঙ্গে বুকের রোগ সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে কাটাই। আমার মনে হয়েছিল ভবিষ্যতে আমার কর্ম্মপন্থা যাই হোক না কেন ঐ সমস্ত শারীরযন্ত্র সম্বন্ধে পড়াশুনা করা খুবই প্রয়োজন। ফুসফুসে বিষ সঞ্চারিত হ'লে সঠিকভাবে কি ক'রে নির্ণয় করতে হয় তা আমি শিখেছিলাম। যখন কারও ফুসফুসে ফোড়া হয়েছে কিনা নির্ণয় করতে হ'ত এবং ঐ ফোড়া গলিয়ে ফেলতে হত তখন আমার এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনে খুবই কাজে লাগত।

এই ধরণের কর্ম্ম-ধারা থেকে বেশ স্পষ্টই বোঝা যাবে যে যদি কেউ কোনও বিষয়ে উপদেশ লাভ করতে উৎসুক হয় তাহ'লে সে বিষয়ে সে উপদেশ লাভ করতে পারে। যে কেউই এই অনুমানের উপর ভিত্তি করেই কাজ সুরু করতে পারেন এবং যদি কোনও জিনিষ লাভ করবার জন্য প্রবল বাসনা থাকে তাহ'লে তা তিনি লাভ করবেনই। তার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে কোথায় তা পাওয়া যেতে পারে তা খুঁজে বার করা। অল্পবয়স্ক অনেক শিক্ষকেরাই বাড়ীতে ছাত্র পড়াতেন। এক এক শ্রেণীর দশজন ছাত্রকে একত্রে পড়াবার জন্য সাধারণত মাইনে নিতেন পঞ্চাশ মার্ক ক'রে। অনুসন্ধানের পর আমরা এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছলাম যে আমরা ঠিক এই ধরনের লোকই খুঁজছিলাম এবং তিনিও ছিলেন Gerhart-এর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ এবং তাঁরই রোগীর সংখ্যা ছিল সব চাইতে বেশী। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। ঠিকই হল, তিনি মাসে পঞ্চাশ মার্ক নিয়ে আমাদের পড়াতে রাজী হলেন কিন্তু কতদিন পড়াবেন তা ঠিক করে বললেন না। ঠিক দিনে আমি ও আমার বন্ধু তাঁর বাড়ীতে হাজির হলাম এবং আমি তাঁর হাতে পাঁচশ মার্ক দিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আরও বাকী

আটজন ছাত্র কোথায়?" উত্তরে বললাম, "আমাদের দু'জনকেই দশ জনের তুল্য ব'লে মনে করুন।" তিনিও খুসী হলেন। এটা তাঁর কাছে খুবই প্রীতিকর হ'ল কেননা যদিও তিনি দশ জনকে পড়াবার খরচ পেলেন আসলে তাঁকে পড়াতে হল মাত্র দু'জনকে। আমাদের ধারণামত ফল বেশ ভালই হল। সংখ্যায় আমারা দু'জন ছিলাম ব'লেই হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলি আমাদের পরিচালনা করতে দেওয়া সম্ভব ছিল। আমরা চারটের সময় হাজির হতাম এবং সেই দিনে যে সমস্ত রোগী ভর্ত্তি হ'ত তাদের পরীক্ষা করে দেখতাম। রোগীদের কোনও প্রশ্ন করবার অধিকার আমাদের ছিল না। ঐ পরীক্ষাটি ছিল নিছক স্বাভাবিক পর্য্যবেক্ষণের ফল। আমরা আমাদের পর্য্যবেক্ষণের ফল রোগীর গায়ের উপর লিপিবদ্ধ ক'রে রাখতাম,—আমার বন্ধু এক রকম চিহ্ন ব্যবহার করতেন আর আমি করতাম অন্য ধরণের। শিক্ষকও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উভয়েরই পর্য্যবেক্ষণের ফল বুঝতে পারতেন। শিক্ষক আসতেন ছ'টার সময় এবং তখন রোগীদের পরীক্ষা ক'রে দেখতেন—প্রধান অধ্যাপকের বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে পাঠাবার জন্য উপযুক্ত রোগী ওর মধ্য থেকে বাছাই করাই ছিল তাঁর নিত্যনৈমিক কাজ। সাধারণতঃ সাতটা বাজত তাঁর এই সমস্ত পরীক্ষা শেষ করতে। সব চাইতে আশ্চর্য্যজনক কেস্‌গুলি পরের দিন হাসপাতালে দেখাতে হত। আমরা ইচ্ছা করলে ঐ সমস্ত হাসপাতালে গিয়ে তখনকার দিনে একজন খ্যাতনামা ইনটারনিষ্ট Gerhardt ঐ রোগীদের সম্বন্ধে কি মন্তব্য করতেন শুনতে পারতাম। এতেও যদি আমরা সন্তুষ্ট না হতাম তাহ'লে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হয় নির্দ্দিষ্ট বা অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য আমাদের অপেক্ষা ক'রে থাকতে হত এবং তারপরে Gurgons-এর ময়না-তদন্ত করার সময়ে হাজির থেকে বিষয়টি বিশদভাবে বুঝে নিতে পারতাম। বুকের নানান রোগ সম্বন্ধে

জ্ঞানলাভ করবার ঐটি ছিল খুব ভাল পন্থা। আমরা এক বছর যাবৎ ঐ ভাবে পড়াশুনা চালাই।

অনেক জার্মান অধ্যাপক আমার মত নগণ্য অল্পবয়স্ক একজন বিদেশী যুবককে যে ভাবে নানা উপায়ে সাহায্য করেছিলেন, কোনও আমেরিকান অধ্যাপক কখনই আমার প্রতি ঐ ধরনের ব্যবহার করেন নি। ওঁদের কাছে জাতিভেদ ব'লে কোনও বোধ ছিল না, যে কেউই শিখতে চাইত তাঁদের সাহায্য করবার জন্য তাঁরা এগিয়ে আসতেন। তাঁদের ঐ ব্যবহারের প্রশংসা না ক'রে পারি না। ঐ ভাবে লেখাপড়া শিখতে এবং ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে মোট খরচ পড়ত ঠিক ষাট মাক অর্থাৎ বছরে পনের ডলার করে। লেখাপড়া শেষ হবার পর Waldayer আমাকে অনুরোধ করলেন অ্যানাটমিতে তাঁর সহকারী হয়ে কাজ করবার জন্য। Virchow প্রায়ই আমাকে অস্ত্রচিকিৎসক হবার সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত করতে চেষ্টা করলেন এবং যাতে আমি গবেষণা সক্রান্ত কাজ নিয়েই থাকি সেজন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। "যে সমস্ত চিকিৎসকের মাথায় উদ্ভাবনী শক্তি আছে তাঁরা যেন রোগী দেখার কাজে তাঁদের সময় নষ্ট না করেন। কেননা কখনও না কখনও রোগী ত মরবেই। সত্য কিন্তু চিরকালই বেঁচে থাকবে"—এই ছিল তাঁর উপদেশ।

বার্লিনে আমার অভিজ্ঞতার কথা আমি যখনই ভাবি তখনই আমার মনে পড়ে যে আমি কয়েকজন অমর-খ্যাতি সম্পন্ন মহাপুরুষের বাণী শুনেছিলাম। অবশ্য তাঁরা যা বলতেন তা সমস্তই বইয়ে লেখা ছিল, কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিত্ব আমাদের অনুপ্রেরণা দিত। তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগ অধ্যাপকেরই বয়স ছিল ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে। তাঁরা সকলেই ছিলেন অতীব কর্ম্মঠ। প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সব চাইতে বেশী আগ্রহ নিয়ে মনোযোগের সঙ্গে অ্যানাটমি পড়াতেন Waldayer।

Litten তখনও আশা রাখতেন রক্ত কণিকাগুলি কি ভাবে অবস্থান করছে তা গবেষণা ক'রে আবিষ্কার করবার। Virchow যদিও তখন আশী তবুও তিনি রোজ ভোর বেলায় তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা মন্দিরে পৌঁছতেন এবং নিজের হাতেই তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক নমুনাসমূহের উপর পরিচয়পত্র লাগিয়ে রাখতেন। তাঁদের পরিণত বয়সেও তাঁরা কি কঠোরভাবে পরিশ্রম করতেন তার স্মৃতি আজকের দিনের তরুণদেরও অনুপ্রেরণা দেবে। তাঁরা আমরণ পরিশ্রম করেছেন। তাঁদের নিজের নিজের কাজের প্রতিও তাঁদের কি গভীর আকর্ষণ ছিল এইটাই হচ্ছে তার চূড়ান্ত উদাহরণ। একদিন যখন শরীরস্থ-রস-বিশেষের একটি ইন্‌জেকসান নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি তখন অধ্যাপক Virchow আমাকে বললেন: "যাঁরা নিজেদের কাজ সুষ্ঠুভাবে করবার জন্য চোখের জল না ফেলেছেন তাঁরা বুঝবেন না আকুলভাবে চেষ্টা করার অর্থ কি।"

আমি এইভাবে উপাধি পরীক্ষার জন্য দু'বছর যাবৎ কঠোর পরিশ্রম করি এবং তারপর বাড়ী ফিরে আসি। চার বছর কাটল আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট শ্রেণীতে পড়তে, আরও চার বছর গেল রোগী দেখে দেখে গবেষণা করতে এবং দু' বছর গেল বার্লিনে—মোট দশ বছর যাবৎ চিকিৎসা শাস্ত্র পড়বার পর আমার বিদ্যালয়ে পড়বার পালা শেষ হল এবং লোকেরা আমার সম্বন্ধে উল্লেখ করতে হলে সস্নেহে বলত "তরুণ চিকিৎসকটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।" অস্ত্র-চিকিৎসা পেশা হিসাবে গ্রহণ করা আমার কাছে মনে হত কল্পনা বা একটি আশা—এ ছাড়া আর বেশী কিছু নয়। আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট শ্রেণীর পড়া শেষ হল, গ্র্যাজুয়েট শ্রেণীর পড়াও করলাম এবং তখনও বাকী রইল আমায় মনোমত পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট শ্রেণীর পড়াশুনা শেষ করা। জ্ঞানার্জ্জনের পথে নির্দ্দেশ দেওয়ার মত আমার কেউ ছিল না: না ছিল কিছু বৈজ্ঞানিক নমুনা, না ছিল রোগী, না বই এবং অর্থও কিছু ছিল না। এ সমস্তই

আমাকে খুঁজে বার করতে হত, কবে এবং কোথা থেকে সেইটাই ছিল সমস্যা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গ্র্যাজুয়েট এবং পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট শ্রেণীর পড়াশুনায় তুলনাগত পার্থক্য সম্বন্ধে আমরা চিকিৎসকেরা এই ধারণা পোষণ করতাম যে গ্র্যাজুয়েট শ্রেণীর পড়াশুনা সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেয় কোনও না কোনও বিদ্যালয় এবং পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট শ্রেণীর পড়াশুনা হচ্ছে নিজের নির্দ্দেশমত পড়াশুনা করা। সাধারণতঃ অবশ্য এক মাস বা কিছু সময় যাবৎ কোনও বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করাকে পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েটের পড়া ব'লে অনেকে আখ্যা দেন। ঐ ধরনের পড়াশুনাকে 'গবেষণা' আখ্যা দেওয়ার জন্য খবরের কাগজওয়ালারাই দায়ী। উদাহরণস্বরূপ বলছি, আমার এক বন্ধু তিন সপ্তাহ কাটালেন Maine woods-এ এবং ফেরবার পথে এক সপ্তাহ যাবৎ New York এ রইলেন—একটি স্থানীয় খবরের কাগজের মতে তিনি ঐ সময়ে 'গবেষণা' কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। আরও বৃহত্তর অর্থে পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েটের পড়াশুনা হচ্ছে বাড়ীতে পড়াশুনা এবং কোনও বিদ্যালয়ে থেকে পড়াশুনা এই দু'য়েরই সংমিশ্রণ। বিদ্যালয়ের পড়া শেষ হবার পর থেকে ওর সুরু হয় এবং তারপর বহুদিন যাবৎ-ই তা চলতে থাকে।

এখানে আমরা একটু আলোচনা করব যে-সমস্ত উচ্চাভিলাষী চিকিৎসক কিভাবে একটি বিশেষ বিষয়ে নিজেদের উপযুক্ত ক'রে তুলতে চান, তাঁদের প্রতি চিকিৎসকদের বর্ত্তমান মনোভাব কি ধরনের। এখানে

আমরা সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করব। কয়েকটি কলা শিক্ষার সমিতির পরিচালনাধীন কলেজগুলিতে দর্শনশাস্ত্রের ডক্টরেট উপাধিপ্রাপ্ত অধ্যাপক রাখার নিয়ম ছিল। ওর অর্থ হচ্ছে এই যে, ঐ ধরনের কলেজগুলির হীনভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুকরণ করা, যদিও ওদের উভয়ের কর্ত্তব্যকর্ম্ম বিভিন্ন ধরনের। কিন্তু জ্ঞানী অধ্যাপকের পাণ্ডিত্য নির্ণয় করার পক্ষে কেবলমাত্র ডিগ্রীগুলিই যথেষ্ট নয় কারণ পারদর্শিতা বিচার করবার কোনও মানদণ্ড নেই। এ ছাড়া এমন কি খুঁজে বার করতে হবে যা দিয়ে পাণ্ডিত্য বোঝা যায়। চিকিৎসা শাস্ত্রের বিদ্যালয়-গুলি ঐ একই ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত অর্থাৎ নির্ধারিত আদর্শের অনুরূপ করণ।

আমার ছাত্রাবস্থার সময়েই চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান সব চাইতে বেশী দ্রুতগতিতে বর্দ্ধিত হয়েছিল। ঐ অগ্রগতি এত দ্রুত ছিল যে কেউই তাতে সামান্য অংশ গ্রহণ করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে নি। আমার ধারণা সব সময়েই পুরণ নিয়ম বদলাচ্ছে এবং তার জায়গায় নতুন নিয়ম আরও ভালই হচ্ছে।

তর্কের খাতিরে বলা হয় বিশেষজ্ঞ হওয়ার আগে সাধারণভাবে বহু রোগী দেখা প্রয়োজন কারণ তাহ'লে কোনও বিষয়ে অহেতুক সঙ্কীর্ণ মত পোষণ করার প্রবৃত্তি থেকে রেহাই পাওয়া যায়। সেইজন্য পিঠের ব্যথা Orthopedist-এর কাজে এমন এক জিনিষের নির্দ্দেশ দেবে যার জন্য একটি Cast বা brace করা প্রয়োজন হবে। গাইনকোলোজিষ্ট যখন এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করবেন তখন বুঝতে হবে যে তলপেটের অধো-গহ্বরে অস্ত্রচিকিৎসা করা প্রয়োজন। কিন্তু যাঁরা ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন তাঁরা প্রথমে ভাববেন যে ওটা হয়ত কোমরের বাত বেদনা। ঐ কথার মধ্যে কিছু সত্য আছে, কিন্তু যাঁরা একটির পর একটি রোগ বাদ দিয়ে তবে আসল রোগ ধরতে পারেন তাঁদের বেলায় তা প্রযোজ্য। কিন্তু

যিনি বিশেষজ্ঞ তিনি আঘাত সরাসরি উপলব্ধি করতে পারবেন এবং সম্ভবতঃ এরকম ভুল তিনি করবেন না। কিন্তু যে-সমস্ত বিশেষজ্ঞ যে কোনও রোগেই তাঁর বিশেষ গণ্ডীর কোনও রোগের আবির্ভাব খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেন, তিনি খুব ভাল বিশেষজ্ঞ নন। জ্ঞানী বিশেষজ্ঞরা এই সব ক্ষেত্রে এরকমই বলবেন যে, কি রোগে রোগী ভুগছেন তা তিনি বলতে অক্ষম এবং ঐ রোগ তাঁর অধীত বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে পড়ে না। এই ধরনের বিশেষজ্ঞরাই তাঁদের শ্রেণীর মধ্যে সর্বোত্তম। তিনি একটির পর একটি রোগ বাদ দিয়ে কি রোগে রোগী ভুগছেন তা নির্ণয় করেন না. তিনি রোগের যথার্থ লক্ষণ দেখে সরাসরি রোগ নির্ণয় করেন।

চিকিৎসা শাস্ত্রের আধুনিক পাঠ শেষ করবার পর বা দু' এক বছর হাসপাতালে থেকে কাজ করবার পরও যথার্থ চিকিৎসক সৃষ্টি সবে সুরু হয়েছে মাত্র,—এর বেশী আর কিছুই বলা যায় না। বরং বলা যায় এখনও সুরু-ই হয় নি। সমস্ত ডিম ফুটেই বাচ্ছা বেরোয় না। আমি একজন বিশেষ জ্ঞানী পণ্ডিত চিকিৎসককে জানতাম কিন্তু তিনি আদৌ পশার জমাতে পারেন নি।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রসম্বন্ধে বড় জোর এই কথাই বলা যায় যে সে যা শিখেছে তা কেবলমাত্র অধীত জ্ঞান এবং ঐ জ্ঞানের প্রতীতি জন্মাতে হ'লে চাই দীর্ঘ দিনের সাধনা। বিদ্যালয়ে অর্জিত জ্ঞান বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অবাস্তব এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐ জ্ঞানের প্রয়োগ কার্য্যকরী হয় না। বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার সময় কত রোগী সে দেখেছে তার শতকরা হার নিয়েই বিব্রত থাকে কিন্তু পরে যখন তাকে রোগী দেখা সুরু করতে হয় তখন প্রতিটি রোগীকেই এক এক করে মনোযোগ সহকারে দেখতে হয়।

আমরা প্রায়ই বৈজ্ঞানিক ধরনে আবিষ্কৃত ঔষধাবলীর কথা বলে থাকি। ঠিক কতটা বিজ্ঞানসম্মত ঐ সমস্ত বৈজ্ঞানিক ধরনে আবিষ্কৃত

ঔষধগুলি তা বলতে পারেন ? আগেকার দিনে তরুণ চিকিৎসকেরা তাঁদের উপাধি পরীক্ষা শেষ হবার পর-ই রোগী দেখা সুরু করে দিতেন। নানান ধরনের রোগাক্রান্ত রোগীদের তাঁরা দেখতেন কিন্তু বিশেষ কিছুই শিখতে পারতেন না। কিন্তু যত বেশী রোগী তিনি দেখতেন ক্রমে ক্রমে তাঁর জ্ঞান ও তত বাড়ত। ক্রমে তাঁর রোগনির্ণয় করবার স্বাভাবিক ক্ষমতা বাড়তে থাকত এবং তাঁর তীক্ষ্ণ কার্য্যকরী বুদ্ধিও বাড়তে থাকত। তাঁকে যে-সব ক্ষেত্রে কাজ করতে হত সেখানে অ্যানাটমি বা প্যাথলজি ব'লে কিছুই ছিল না: তারা কস্মিন কালেও ছিল না। কেবলমাত্র এই বিষয়েই তাঁর সঙ্গে আধুনিক কালের উপাধিপ্রাপ্ত চিকিৎসকের পার্থক্য। আধুনিক কালেও তরুণ চিকিৎসকেরা ঐ একই ধরনে অধীত জ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে। জ্ঞানার্জ্জনের প্রথম সোপানগুলি অবশ্য তাঁর পরের জীবনে জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্য কোনও নির্দ্দেশই দেয় না। প্রথমতঃ তাঁরা বিশেষ কিছুই শেখেন না এবং যৎসামান্যও তাঁরা যা শিখতেন তা অনেক আগেই ভুলে যেতেন।

একজন রেড ইণ্ডিয়ান যেমন পদাঙ্কনুসরণ করতে করতে অনুকরণ করতে শেখে ঠিক ঐভাবেই চিকিৎসকেরা অনুসন্ধান করতে করতে ঔষধের গুণাবলী আবিষ্কার করে। দেশের সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে সব চাইতে সেরা চিকিৎসকেরা ক্রমাগত রোগী দেখে দেখে এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি উপেক্ষা ক'রে তাঁদের জ্ঞান এবং কর্ম্মকুশলতা বাড়িয়ে ফেলেন। আমাদের মধ্যে পারদর্শী বহু অস্ত্রচিকিৎসকই তাঁদের হাসপাতালের কাজে বিজ্ঞানের মূল বিষয়গুলি ব্যবহারই করেন না। সম্ভবতঃ ঐ ধরনের জ্ঞানের কোনও প্রয়োজনই নেই। ব্যাপার দেখে ত' তাই মনে হয়। যাই হোক আমি কিন্তু অনেক অস্ত্রচিকিৎসককেই বহুবার বলতে শুনেছি যে, আবার যদি তাঁরা তাঁদের জীবনের পুরণো দিনগুলি ফিরে পেতেন তাহ'লে তাঁরা 'সার্জিক্যাল প্যাথলজি' ভাল ক'রে পড়তেন।

যিনি বিশেষজ্ঞ হিসাবে নাম করতে চান তিনি অতি অবশ্য খুব ভাল ভাবে জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা করবেন। তাঁর পরিধির, যেমন অ্যানাটমি, ফিজিওলজি এবং প্যাথলজির মূল বিষয়গুলি তিনি ভাল ক'রেই পড়বেন—বিশেষজ্ঞদের জ্ঞানের পরিধি যদিও এত বৃহৎ নয় তবুও তা' করা সম্ভব—কিন্তু যাঁরা সাধারণভাবে সব রকম রোগাক্রান্ত রোগীই দেখে থাকেন তাঁরা জ্ঞানের সর্ব্ব বিভাগে মূল বিষয়গুলি মনে রাখবেন এ আশা পোষণ করেন না।

যাঁরা সার্জারি বা অস্ত্রচিকিৎসা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে চান তাঁদের পক্ষে বাঁধাধরা পন্থা হচ্ছে কোনও একটি হাসপাতালে থেকে কাজ করা। তা' না হ'লে অন্তত পক্ষে একজন সার্জেন যাঁর খুব পশার হয়েছে তাঁর সঙ্গে থেকে তিন কিম্বা পাঁচ বছর সহকারীতা করা। এই ভাবে থেকে তাঁদের কাজ শেখার শেষ দিকে তাঁদের অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে থেকে অপারেশান করা হাতে-কলমে শিখতে হয়। দাতব্য হাসপাতালগুলিতে এই ভাবে কাজ করা খুবই সোজা, কিন্তু যে সমস্ত সার্জেন নিজেরা স্বাধীনভাবে কাজ করেন তাঁদের সঙ্গে কাজ করবার সময় কয়েকটি বাধা এসে উপস্থিত হয়। এই হচ্ছে সব চাইতে সহজ পন্থা এবং মনে হয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। যে সমস্ত ছাত্র পরবর্ত্তীকালে সার্জ্জেন হবার আশা রাখেন তাঁরা সকলেই এই পন্থা অনুসারে কাজ করতে পারেন না।

এবার আমি উপাধি পরীক্ষাকালীন আমার নিজ অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে দেখছি। বার্লিনে থাকাকালে কাজ করবার বিষয়ও যেমন ছিল অনেক, সুযোগও ছিল তেমন প্রচুর। ওখানে দু' বছর কাটিয়ে যখন Kansas-এ ফিরে এলাম তখন কি নিয়ে কাজ করব তাই ঠিক করে উঠতে পারলাম না।

এই সময়ে একটি নামকরা বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যানাটমি-র প্রধান

অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করার আমন্ত্রণ পেলাম। অনেক ভেবে-চিন্তে দেখলাম, যে উন্মুক্ত পরিধি থেকে আমি এসেছি সেখানে ফিরে যাওয়াই আমার পক্ষে স্বাভাবিক। ঘোড়ার পিঠের জিনের চামড়ার গন্ধ যে আমি জীবনে ভুলতে পারব না এ বোধটি তখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। সেই জন্য আমি সাহসে ভর ক'রে একলাই যুদ্ধ করব ব'লে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ভালই করেছিলাম।

পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েটের পড়া আমাকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করেছিল। সার্জ্জারি নিয়ে চর্চ্চা করতে হলে রোগীর প্রয়োজন হত। 'সার্জনের' পেশায় পসার জমাতে হলে সব চাইতে প্রয়োজনীয় জিনিষ যা না হলে চলত না তা হচ্ছে ধৈর্য্য।

সৌভাগ্যবশতঃ অল্পদিনের মধ্যেই আমার পসার বেশ জ'মে উঠল এবং ক্রমে ক্রমে অন্যান্য চিকিৎসকদের কাছ থেকেও আমার পরামর্শ নেবার জন্য বেশী ডাক আসতে সুরু হল। একজন খুব উপযুক্ত সহকারী আমি পেয়েছিলাম এবং গ্রামাঞ্চলের বেশীর ভাগ কাজ তিনিই করতেন এবং সেইজন্য ঘোড়া এবং জুড়ীগাড়ী ব্যবহারের দিন প্রায় শেষ হয়ে এল। এর জায়গায় ট্রেনে ভ্রমণ প্রচলিত হয়ে উঠছিল। এখান থেকে ওখানে অনেক দূর—দূরাঞ্চলে ভ্রমণ করতে হত ব'লেই আমি কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক এবং অস্বাভাবিক রোগাক্রান্ত রোগী দেখতে পেয়েছিলাম এবং প্রায়ই এখন অনেক ধীরনম্র রোগীর দেখা পেতাম যারা তাদের শরীরের উপর আমাকে অপারেশান করতে দিত, বিশেষ ক'রে যখন তারা আরও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মোটা ফী জোগাড় করতে না পারত। টাকা পাওয়া যাক বা না যাক যদি বৈজ্ঞানিক কোনও নমুনা আমি পেতাম তাহ'লেই আমার পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করতাম।

আমি যে সহরে বাস করতাম তা ছোটই ছিল। লোকসংখ্যা ছিল

এক হাজারের মত, সেইজন্য ঐখানে থেকে আমার পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েটের পড়াশুনা চালাবার জন্য অস্ত্রচিকিৎসা-বিদ্যা সম্বন্ধীয় উপকরণ পাওয়ার আশা স্বভাবতই খুব কম ছিল। যখন আমি উপায় উদ্ভাবনের চিন্তা করছিলাম তখন ভাগ্য আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হল, Kansas সহরের মেডিক্যাল কলেজে হিস্টলজি এবং প্যাথলজির শিক্ষকের পদ গ্রহণ করবার আমন্ত্রণ এল।

শিক্ষকতার কাজে বেশীর ভাগ সময়ই ব্যয় করতে হত, এক সপ্তাহে পাঁচ বা ছ' দিন পড়াতে হত। আমার মাসিক বেতন নির্দ্দিষ্ট হল মাসে পঞ্চাশ ডলার হিসাবে। ঐ বিদ্যালয়ের দারওয়ানের মাইনেও ছিল ঠিক একই রকম। আসলে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ আমার পাণ্ডিত্যকে ঐ দারওয়ানের মর্য্যাদার একটু উপরেই স্থান দিয়েছিলেন। প্রথমে অবশ্য ওঁরা আমার প্রতি ঐ রকমই ব্যবহার করেছিলেন। আমাদের দেশের এই অঞ্চলে আমিই ছিলাম একমাত্র অধ্যাপক যাকে বেশীর ভাগ সময়ই শিক্ষকতার কাজে ব্যয় করতে হত। আমি ঐ চাকরিটি পেয়ে খুবই আনন্দিত হ'লাম কেননা ঐ বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে আমার পড়াশুনা চালাবার জন্য উপকরণ সংগ্রহের সম্ভাবনা ছিল। শুধু যে অস্ত্রচিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধীয় উপকরণই পাওয়া যেত তা নয়, তা ছাড়া মৃতদেহ রাখার জন্য যতটা জায়গা পাওয়া যেত সেই অনুপাতে তার চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যায় মৃতদেহ পাওয়া যেত ময়না তদন্ত করবার জন্য। এই কাজে আমি এক অপূর্ব্ব সুযোগ পেলাম—অস্ত্রোপচার করার পর কি কারণে রোগীর মৃত্যু হত তা গবেষণা ক'রে দেখবার। এর সুফল হিসেবে আমি শিখলাম অস্ত্রচিকিৎসায় কোন্ কোন্ জিনিষ করা উচিত নয়। সার্জেনদের পক্ষে এইটিই চরম শিক্ষা। আমাকে পড়াতে হত হিষ্টলজি, ব্যাকটিরিওলজি, প্যাথলজি, সার্জারী, গাইনকোলজি এবং দু'বছর যাবৎ আমাকে শবব্যবচ্ছেদাগার পরিচালনা ক'রতে হয়েছিল। আমাকে দিনে

দশ ঘণ্টা ক'রে হয় পড়াতে হত, নয়ত পড়ানোর জন্য উপকরণ তৈরী করে প্রস্তুত হ'তে হত এবং ক্লাসে হাতে-কলমে পরীক্ষা ক'রে বিষয়গুলি বোঝাতে হত। আমি ব্যাকটিরিওলজি এবং হিষ্টলজি সম্বন্ধে হাতে লেখা ছোট ছোট বই বার করতাম। ওগুলো ছাত্রদের খুব প্রয়োজনে লাগত। আমি যখনই ছোট ছোট বই লিখতাম তখনই গ্যালি-প্রুফের গন্ধ পেতাম এটা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং তা' থেকে আজও রেহাই পাই নি। যখন বিশেষ কোনও শব-ব্যবচ্ছেদ করে পরীক্ষা চলত তখন দিনে আরও দু' ঘণ্টা বেশী খাটতে হত। আমি ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে একাদিক্রমে সাত বছর কাটাই।

শিক্ষকতার কাজ ছাড়াও আমার ল্যাবরেটরির কাজও আমি চালাতাম—বিশেষ করে Peritoneum রন্ধ্রের শোষণের হার নির্দ্দেশ করার কাজে। ঐ সময়ে আমি নিজেই Pulmonary tuberculosis রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ি। পরে আমি ঐ রোগ সম্বন্ধে যথেষ্ট পড়াশুনা করি। আমি গিনিপিগের Peritoneum-এর রন্ধ্রে ওর বীজ ইনজেকশান ক'রে দিই এবং তারপর নানান কার্য্যকারক বস্তুর ফল এবং রোগের ক্রমবিস্তার কিভাবে হত তা গবেষণা করে দেখতাম, বিশেষ ক'রে বাতাস এবং পিত্তের উপর ওর ক্রিয়া কেমন চলত তা গবেষণা ক'রে দেখতাম। আমি করতাম থেকে বিশেষ কিছু আবিষ্কার করতে পারি নি।

আমার দিক থেকে কোনও চেষ্টা না হ'লেও এই সময় নাগাদ এক নামকরা প্রকাশক 'টিউমার' সম্বন্ধে একটি বই লেখার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। ঐ আমন্ত্রণে আমি যে গর্ব্ববোধ করব এ ত স্বাভাবিক। আমি যথেষ্ট উদ্যম সহকারে কাজ সুরু করে দিই। আসলে, উদ্যম ছাড়া আমার আর কিছুই সম্বল ছিল না। ঐ সংক্রান্ত কোনও বইই তখন পাওয়া গেল না: কারুর কোনও লাইব্রেরীও ছিল

না। পরে অবশ্য আমি সার্জেন জেনারেলের লাইব্রেরী থেকে বই নিতে শিখেছিলাম। এভাবে বই নেওয়ার কথা এর আগে কেউ কখনও শোনেও নি। যে ভাবেই হোক বই আমাকে যোগাড় করতেই হত।

আমি নিজেই একটা লাইব্রেরী কিনব মনস্থ করলাম। সেইজন্য একদিন সন্ধ্যাবেলায় একটি বিদেশী পাঠ্য পুস্তকের তালিকা দেখে কয়েক হাজার ডলার মূল্যের বইয়ের অর্ডার দিলাম, বিশেষ ক'রে অসম্পূর্ণ সাময়িক পত্রিকার ফাইলগুলির অর্ডার দিলাম। ঐ সমস্ত বইয়ের দাম দেওয়ার জন্য কোথা থেকে ঐ টাকা পাব সে কথা একবারও ভাবি নি। কিছুদিন পরেই যে-বইয়ের দোকান আমাকে বই বিক্রয় করেছিল তারা আমার চাইতে বেশী ক'রে ভাবতে লাগল কিভাবে বইয়ের দাম আদায় হবে। আমি কিন্তু শেষ পর্যান্ত বইয়ের দাম মিটিয়ে দিয়েছিলাম। এই ভাবে অবিবেচকের মত গ্র্যাজুয়েট শ্রেণীর দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষ বই সংগ্রহ করলাম।

এই বই লেখার অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এক মহামূল্য সম্পদ। এই অভিজ্ঞতাই আমাকে লাইব্রেরী করবার অনুপ্রেরণা দিয়েছিল এবং সব চাইতে মনোযোগ সহকারে আমার বৈজ্ঞানিক উপাদানগুলি পরীক্ষা ক'রে দেখতে বাধ্য করেছিল। এর জন্যই আমি লেখাও অভ্যাস করতে পেরেছিলাম। বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর আমি আসল মূল্য পেলাম, কেননা টিউমার সংক্রান্ত বিষয়ে আমার পরামর্শ নেবার জন্য অন্যান্য চিকিৎসকেরা আমার খোঁজ করতেন।

এই সূত্রে আরও বলি, প্রথমে বহু পুস্তকের বড় অর্ডারটি দেবার পরও আমি মাঝে মাঝে লাইব্রেরীর জন্য আরও বই কিনতাম। আমি সারজিক্যাল প্যাথলজির সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় প্রামাণ্য বই কিনেছিলাম। টাকা ছাড়াও আরও অনেক কিছুই প্রয়োজন একটি লাইব্রেরী গড়তে হলে। আমি সাময়িক পত্রগুলির প্রায় চল্লিশটি সম্পূর্ণ ফাইল যোগাড়

করি। ঐ কাজটি খুব সোজা নয়। এই কাজ করতে খুবই মজা লাগত। এক সময়ে আমার লাইব্রেরীতে আট হাজার বাঁধান বই ছিল এবং ছোট ছোট পুস্তিকা ছিল দশ হাজার। আমি এই সমস্ত বই বহু প্রতিষ্ঠানে দান করি। খুব সম্প্রতি অবশিষ্ট বইগুলিও দান করেছি।

টিউমারের বইটি লেখার সময় আমি এই অভিজ্ঞতাই অর্জন করি যে স্থায়ীভাবে রেকর্ড রাখতে হ'লে আলোকচিত্রের মূল্য অত্যন্ত বেশী। যখনই একটি উপযুক্ত ক্যামেরা কেনার সঙ্গতি আমার হ'ল আমি একটি ছোকরাকে নিযুক্ত করলাম—ক্রমে ক্রমে ঐ ছোকরা এই ধরনের আলোকচিত্রের কাজে নিজ চেষ্টায় সব চাইতে সেরা আলোকচিত্র-শিল্পী হয়ে দাঁড়াল। গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ ও আমার সঙ্গে কাজ করেছে এবং সাধারণ লোকে ওকে জিম্ ব'লেই ডাকত। আমার ক্লিনিকে একটি ঢালোয়া হুকুমই ছিল যে কোনও জিনিষ যা চোখে দেখা যায়, তার আলোকচিত্র যেন নেওয়া হয়। যখন কেউ কোনও বইয়ে আলোকচিত্র প্রকাশ করতে চান তখন তার ত মূল্য থাকেই তা ছাড়াও রেকর্ড রাখার সময়েও আলোকচিত্রের মূল্য খুবই বেশী।

সার্জেন হতে হলে কি কি করতে হয় সেই চিন্তা বেশ কয়েক বছর যাবৎ আমার চিত্ত অধিকার ক'রে রেখেছিল এবং ওর ইতিহাস যা আমি বর্ণনা করছি তা পরীক্ষামূলক। ভাল সার্জেন হতে হলে অল্পবয়স্ক যুবককে প্রথমতঃ মূল বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলিতে জ্ঞানার্জ্জন করতে হবে—বিশেষ ক'রে অ্যানাটমি এবং প্যাথলজিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হবে। গায়কের কাছে বাদ্যযন্ত্র যেমন অপরিহার্য্য তেমনই সার্জেনের কাছে ঐ জিনিষগুলি অপরিহার্য্য। বাদ্যযন্ত্র হয়ত খুব উচ্চ শ্রেণীর হতে পারে এবং গায়কও হয়ত গানের সুরতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শী,—কিন্তু সব চাইতে বেশী ঐক্যতানের সৃষ্টি করা তখনই সম্ভব যখন গায়ক বেশ কয়েকবার ঐ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেছেন। সেরা সার্জেন চেষ্টা করে হওয়া যায় না,

যেমন সেরা গায়ক চেষ্টা করলেই হওয়া যায় না—জন্ম থেকেই কেউ সেরা সার্জেন কেউ বা সেরা গায়ক। এও সম্ভব, জন্মের সুরু থেকে যাঁর মধ্যে সেরা সার্জেন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, কিন্তু চেষ্টা এবং অধ্যবসায় সহকারে তাঁর প্রতিভাকে বিকাশ করতে না পারলে কোনও দিনই হয়ত তাঁর পক্ষে সেরা সার্জেন হওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। অস্ত্র চিকিৎসায় পারদর্শী হ'য়ে উঠতে হলে সুরু থেকেই সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে তার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবার চেষ্টা করতে হবে। এইটিই হচ্ছে অস্ত্র চিকিৎসায় সাফল্যের মূলমন্ত্র।

আমি আগেই যা বলেছি, অস্ত্রচিকিৎসা বিদ্যা শিখতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন রোগীর। রোগী যোগাড় করবার অবশ্য বাঁধা-ধরা এমন কোনও নিয়ম নেই। আকস্মিক ভাবেও রোগী পাওয়া সম্ভব। রোগী পাওয়ার পর দ্বিতীয় কর্ত্তব্য হচ্ছে তাকে নিজের হাতে রাখা। প্রথমে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং তারপরের কর্ত্তব্য হচ্ছে তার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করা। প্রথম বিষয়টিতে সাফল্য লাভ করতে হলে চাই বিশেষ ধরনের কয়েকটি দক্ষতা। দ্বিতীয় বিষয়টিতে সাফল্য লাভ করতে হলে রোগীর মনে এই ধারনাই বদ্ধমূল করাতে হবে যে চিকিৎসক একজন সাধু প্রকৃতির লোক। এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করতে হলে সত্যিই তাকে সাধু হতে হবে। নেহাৎ বোকা লোকই অন্য ধরনের ব্যবহার করবে।

রোগী হাতে পাওয়ার পর প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে তার রোগের ইতিহাস জেনে নেওয়া। রোগের নিখুঁত ইতিহাস সংগ্রহ করা কলার একটি অঙ্গবিশেষ। নিখুঁত ইতিহাস সংগ্রহ করতে হলে চাই রোগ এবং মানুষের প্রকৃতির সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা। এটা খুবই কঠিন কাজ এবং সময়সাপেক্ষও বটে। কিন্তু এটা খুবই দরকারী, কারণ রোগের চিকিৎসা করার ব্যাপারে এইটাই হচ্ছে সব চাইতে প্রয়োজনীয় বিষয়। একটি

নিখুঁত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করার পর অনুবীক্ষণ যন্ত্রের শ্লাইডে কি ধরা পড়বে সে বিষয় অনেক সময় আগে থেকেই ব'লে দেওয়া যায়।

সাধারণত সহকারী চিকিৎসকদেরই কাজ হচ্ছে রোগীর রোগের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা—কাজটি কিন্তু খুবই কঠিন। এ কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। "চিকিৎসক এবং আইন-ব্যবসায়ীর কাছে সত্য কথা বলবে" —এই পুরণো প্রবাদটি প্রকৃতই একটি ভাল উপদেশ। যদিও রোগীরা কিছু গোপন না ক'রে সব কথা বলারই চেষ্টা করে তবুও নানান বাধা উপস্থিত হয়। রোগীর পক্ষেও হয়ত তার সমস্ত রোগের বর্ণনা করা সম্ভবপর না হতে পারে। এটা আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যখন একজন চিকিৎসকের রোগনির্ণয় করবার চেষ্টা করেন। শরীরের ঠিক কোন্ জায়গায় যন্ত্রণা হচ্ছে বা কি ধরনের কষ্ট হচ্ছে তা নির্দেশ করা বিশেষ ক'রে পেটের অথবা মাথার কোনও যন্ত্রণার কথা বলা একজন চিকিৎসকের পক্ষেও শক্ত। চিকিৎসকেরা যখন তাঁদের রোগের ইতিহাস বর্ণনা করবার চেষ্টা করেন তখন এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেন!

রোগীরা নিজেদের রোগ বর্ণনা করবার সময় খুবই বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলেন এবং তাঁদের ঐ আবেগময় বর্ণনা থেকে রোগের আসল গুরুত্ব নির্ণয় করতে হলে খুবই সাবধান হতে হবে। যখন কোনও চিকিৎসক কোনও রোগীকে ধূমপান করতে বা মজার মজার বই পড়তে দেখেন বা কোনও রোগীকে ভালভাবে সাজগোজ করতে দেখেন তখন রোগী যতই তাঁর শরীরের ভীষণ কষ্টের কথা বলতে থাকেন চিকিৎসকেরা নিজেরা মনে মনে বিচার ক'রে বুঝতে চেষ্টা করেন ভীষণ যন্ত্রণার আসল গুরুত্ব কতটুকু! মহিলাদের ব্যাপারে তাঁদের নিজেদের বর্ণনার চাইতে তাঁদের ঠোঁটের রুজ দেখে ডাক্তারবাবুরা আরও ভালভাবে রোগের আসল গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করতে পারেন। রোগীরা যখন অনুযোগ করেন যে সমস্ত রাত তাঁরা ঘুমোতে পারেন না বা তিন সপ্তাহ যাবৎ তাঁরা কিছুই

খেতে পারেন নি, অথচ যদি দেখা যায় তাঁদের দেহের ওজন একটুও কমে নি তখনই বোঝা যায় নিজেদের রোগের কথা তাঁরা অতিরঞ্জিত ক'রে বলছেন। সুতরাং এটা সহজেই বোঝা যাবে যে, ওঁদের ঐ সমস্ত অতিশয়োক্তি শুনে চিকিৎসক যদি কোনও ধারণা করেন তা হবে একটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। ইচ্ছা ক'রে যে সমস্ত মিথ্যা কথা তাঁরা বলেন সেগুলো সহজেই ধরা যায়, কিন্তু রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে যখন তাঁরা ভ্রান্ত ধারণা ব্যক্ত করতে থাকেন তখন আসল ব্যাপার বুঝতে পারা বেশ শক্ত।

এই সমস্ত ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ের ন্যায্যতা নির্ভর করে চিকিৎসকের যুক্তিসিদ্ধ ক্ষমতার উপর বা প্রতিটি বিষয়ের তুলনামূলক মূল্য নির্দ্ধারণ করবার শক্তির উপর। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সব চাইতে সেরা ক্ষমতার প্রয়োজন।

এইভাবে রোগীর রোগের ইতিহাস সংগ্রহ করবার পর দৈহিক পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। রোগের ইতিহাস ভালভাবে পর্য্যালোচনা করার পর সহজেই আসল রোগ কি তা ধরতে পারা যায়। এর পরও হয়ত কয়েকটি ল্যাবরেটরির মধ্যে কয়েকটি পরীক্ষার প্রয়োজন, যেমন রঞ্জনরশ্মি পরীক্ষা বা রাসায়নিক পরীক্ষা। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একটি যথার্থ কার্য্যকরী জ্ঞান লাভ করা যায়। কয়েকটি ব্যাপারে এ ছাড়াও রোগীর উপর অস্ত্রোপচার করা কালীন কয়েকটি জ্ঞান তাঁকে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে সাহায্য করে।

ভালভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখার পর কিভাবে অস্ত্রোপচার করা হবে সে সম্বন্ধে ভেবে চিন্তে দেখা হয়। সার্জেন আসল অস্ত্রোপচার করার আগে নিজের মনে মনে ঠিক ক'রে নেন কিভাবে অস্ত্রোপচার করবেন। রোগী নিজে যা যা বলেন এবং চিকিৎসক নিজে যা দেখেন বা বোঝেন এই দু'টো ভিত্তির উপর নির্ভর ক'রে তিনি কিভাবে তাঁর সমস্যার

সমাধান করবেন তা ঠিক ক'রে ফেলেন। অস্ত্রোপচার করবার আগে চিকিৎসককে বেশ ভালভাবে বুঝতে হয় রোগীর ব্যক্তিগত চরিত্র, লক্ষ্য করতে হয় রোগী বৃদ্ধ কিম্বা তরুণ, মোটা অথবা রোগা, রোগীর স্বাস্থ্যই বা কেমন এবং তা ছাড়াও অস্ত্রোপচারের প্রতি এবং যে সার্জেন অস্ত্রোপচার করবেন তাঁর প্রতি রোগীর মনোভাব কি ধরনের তা বুঝতে হবে। তার পরে আসে যথার্থ মূল সমস্যা। অস্ত্রোপচার করার আগেই ভালভাবে ভেবে দেখতে হবে অস্ত্রোপচার করার পর নূতন কোনও বিপদের আশঙ্কা থাকতে পারে কি না অথবা অস্ত্রোপচার না করলেই বা রোগীর অবস্থা কেমন দাঁড়াবে।

সুখের বিষয় বহু রোগীর উপরই অস্ত্রোপচার ক'রে চিকিৎসা করার প্রয়োজন হত না যখন কোনও সার্জেন কোনও ওষুধ দেন তখন তিনি যেন একজন চিকিৎসক হয়ে পড়েন। একজন চিকিৎসকের জীবনে রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করা এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার। ভালভাবে অস্ত্রোপচার করতে হ'লে ঐ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। অভিজ্ঞতা যত বাড়বে দক্ষতাও তত বেড়ে উঠবে—কিন্তু ঐ ধরনের কাজ করতে খুব কমই মানসিক শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। ঐ বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা লাভ খুবই সোজা—শক্ত হচ্ছে লক্ষণ দেখে ঠিক করা অস্ত্রোপচার করতে হবে কি না। অনেক ঘটনা থেকে এই প্রমাণিত হবে যে বহু সার্জেনই এই হাতের দক্ষতার বেশী আর কিছুই দেখাতে পারেন নি। সেরা দক্ষ সার্জেন তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করেন কেবলমাত্র তাঁর অস্ত্রোপচার করার নিপুণতা দেখিয়েই নয়—সমস্ত ব্যাপারটিই তাঁরা সুস্পষ্ট বুঝতে পারেন।

রোগের লক্ষণ থেকে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন কিনা—এ বিষয়ে মতবিরোধের অবকাশ থাকে। কিন্তু অস্বাচ্ছন্দ্য থাকতে পারে এবং তা যথাসময়ে কমতে পারে কিংবা হয় ত' সারা জীবনব্যাপী কোনও ক্লেশও থেকে যেতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রেই মতবিরোধ দেখা যায় অস্ত্রোপচার করা হবে কি না সেই বিষয় নিয়ে এবং চিকিৎসকেরাও কিছুতেই পরস্পরের সঙ্গে একমত হতে পারেন না—এই ব্যাপার দেখে সাধারণ লোক অবশ্য মজাই অনুভব করবেন। চিকিৎসকদের এই মতানৈক্য দেখে ঠিক যে কেন সাধারণ লোকেরা কৌতুক অনুভব করে তা বলা শক্ত, তবে খুব সম্ভবতঃ মনে হয় ডাক্তারদের মধ্যে সাধারণতঃ মতের মিল হয় ব'লেই তাঁদের মধ্যে অনৈক্য দেখলে সাধারণে কৌতুক অনুভব করে। বৈচিত্র্যের প্রতি চিরকালই মানুষের আকর্ষণ আছে। কেন তারা আমাদের দেখে হাসে? আইনজীবিরা যখন কোনও বিষয়ে একমত হন তা যেমন এক অঘটন তেমনিই অঘটন হচ্ছে চিকিৎসকেদের মধ্যে যখন মতানৈক্য দেখা দেয়। স্বর্গে যাওয়ার পথ একটিই কি না অথবা কোন্‌টি সব চাইতে সেরা পথ সেই বিষয় নিয়ে পুরোহিতদের মধ্যেও ত' মতানৈক্য দেখা দেয়।

আমার সারজিক্যাল উপাদান সম্বন্ধে পড়াশুনার গভীরতা বোঝা যাবে আমার লেখা সারজিক্যাল প্যাথলজি সম্বন্ধে দশ খণ্ডের পুস্তক পড়লে। রোগীদের কাছ থেকে যা আমি শিখেছিলাম—অন্ততপক্ষে তারা আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছিল ব'লে আমি মনে করি—তারই ফলে আমি এই বইগুলো লিখেছি।

নবম পরিচ্ছেদ

আজকালকার দিনের তরুণ চিকিৎসকেরা মনে করেন যে হাসপাতালের বাইরে রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করা সম্ভব নয়। যে সমস্ত চিকিৎসক অস্ত্রোপচার করেন না তাঁরা কখনও কখনও রোগীর কাছে এই অজুহাত দেখান যে তাঁরা রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করতে পারেন

না, কেননা হাসপাতালের সুখ-সুবিধা রোগীর গৃহে পাওয়া সম্ভব নয়। এ ধরনের মনোভাব তাঁদের আসল অক্ষমতাকে ঢাকা দেওয়ারই প্রচেষ্টা।

সাবেক দিনের অস্ত্রোপচার কিভাবে করা হত সে কথা এখন ভুললে চলবে না, কারণ তখন যদি এর প্রতি মনোযোগ দেওয়া হত তাহলে তা থেকে আজ অনেক কিছুই শেখা যেত। সুষ্ঠুভাবে অস্ত্রোপচার করতে হ'বে এই বিষয়টি সকলেই স্বীকার করবেন। কি ভাবে চিকিৎসক সুষ্ঠুভাবে অস্ত্রোপচার করতে শিখবেন রোগীর তরফে এটা নিতান্তই অবান্তর।

সাবেক কালের অস্ত্রোপচার করার সময় দু'টো জিনিষের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হত, এবং সুষ্ঠুভাবে অস্ত্রোপচার করতে হলে ওই দু'টো জিনিষের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। ঠাট্টা ক'রে বললে বলতে হয়, দু'টো জিনিষের একটি হচ্ছে সার্জেন এবং অন্যটি রোগী। হাসপাতালের নানান সুখ-সুবিধার মধ্যে এবং উপযুক্ত সহকারীর সহযোগিতায় আমি বহুদিন যাবৎ হাসপাতালে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু কয়েকটি সেরা অস্ত্রোপচার করি আজকের দিনের তুলনায় অনেক অসুবিধাজনক আবেষ্টনীর মধ্যে।

ঐ বিষয়ে সমস্ত খুঁটিনাটির উপর জ্ঞানলাভ করার পক্ষে সাবেক কালের অস্ত্রচিকিৎসা বিদ্যা খুব সাহায্য করত। সার্জেনদের কাছে রোগীর ক্ষতই ছিল একমাত্র বিষয় যা তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারত। আশেপাশে কি ঘটছে তা নিয়ে মোটেই তিনি মাথা ঘামাতেন না। আমি যখন এই ধরনের আবেষ্টনীর মধ্যে অস্ত্রোপচার করতাম তখন আমাকে ব্যাকটিরিওলজিও পড়াতে হত। আমি দু'টি বিষয় নিয়ে খুবই পড়াশুনা করি—একটি হচ্ছে হাত দু'টিকে জীবাণুবিহান করা, অন্যটি হচ্ছে নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের মারফৎ রোগের জীবাণু শরীরকে আক্রমণ

করতে পারে কি না। হাত দু'টিকে জীবাণুবিহীন করতে হলে আমি তখনকার দিনের প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করতাম। অনেকক্ষণ ধ'রে হাত ঘষে ঘষে ধুতে হত। তারপর একটি রাসায়নিক জলীয় দ্রব্যের মধ্যে হাত দু'টি ডুবিয়ে রাখতে হত। আমি অবশ্য এটা খুব স্পষ্ট করে বুঝিয়ে উঠতে পারি নি যে যত বেশী ঘষে ঘষে হাত ধোওয়া হত তত বেশী হাতের চামড়ার উপর থেকে জীবাণুগুলিকে দূর করে দেওয়া হত। যখনই ভাবতাম ঐ সমস্ত জলীয় রাসায়নিক দ্রব্যগুলি জীবাণুগুলোকে সম্পূর্ণ-ভাবে বিনাশ করতে কত দীর্ঘ সময় নিত তখনই হাত ঘষে ঘষে ধুয়ে নেওয়ার পরও রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে হাত ডুবিয়ে রাখাটা আমার কাছে হাস্যকর বলে মনে হত। সুখের বিষয় অস্ত্রোপচার কক্ষে আজ-কাল ঐ ধরনের কার্য্যকলাপ লোপ পেয়েছে।

নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মারফৎ যাতে রোগের জীবাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ না করে মুখোস প'রে অস্ত্রোপচার করার সার্থকতা সেইখানে। এই ধরনে শ্বাস-প্রশ্বাস মারফৎ কিভাবে রোগের জীবাণু আক্রমণ করে তাই নিয়ে আমি অনেক গবেষণা করেছি। আমি খোলা জায়গায় দু' প্লেট শিরিষ রেখে দিই। আমি যখন শ্লাইডের কাজ করছিলাম তখন ঐ দুটো প্লেটের একটি আমার খুব কাছেই রেখেছিলাম, যেমন অস্ত্রোপচার করবার সময় রোগীর ক্ষত আমাদের কাছেই থাকে। অন্য প্লেটটি ল্যাবরেটরিতে কাজ করবার টেবিলের অন্য প্রান্তে রেখেছিলাম। দু'টি প্লেটের উপরই "কলোনী"র সংখ্যার কোনও পার্থক্য ছিল না। আমি এই ধরনের গবেষণাটি অনেকবার করি। অস্ত্রোপচার করবার সময় আমি মুখ বুজে থাকাই পছন্দ করি, সেইজন্য আমার কাছে মুখোস ব্যবহার করা অর্থহীন।

পচনরহিত অস্ত্রোপচার করতে হলে সব চাইতে প্রয়োজন যত শীঘ্র সম্ভব অস্ত্রোপচার শেষ করা। চিকিৎসক জীবনের প্রথম দিকে আমি

একটি আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা লাভ করি। আমাদের দলে একজন সার্জেন ছিলেন যিনি অ্যানাটমি-তে একজন বিশেষজ্ঞ। হাসপাতালের কাজেও তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি তাঁর পরিণত বয়সে পচনরহিত অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তিনি খুব ভালভাবে শিখতে পারেন নি। আমাদের মত তরুণ চিকিৎসকদের কাছে তাঁর স্বতন্ত্র অস্ত্রোপচার প্রণালী হাস্যকর ব'লে মনে হয়েছিল। আমাদের মত তরুণদের দ্বারা অস্ত্রোপচারের ফলে যত বেশী সংক্রমণ হত তার চাইতে অনেক কমই সংক্রমণ হত সেই সমস্ত অস্ত্রোপচারগুলিতে যেগুলো তিনি করতেন, যদিও তাঁর অস্ত্রোপচারের প্রণালী ত্রুটিপূর্ণ ছিল। আমরা যে সমস্ত অস্ত্রোপচার শেষ করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নিতাম সেগুলো তিনি শেষ করতেন পনের মিনিট সময়ের মধ্যে। আমরা আমাদের অস্ত্রোপচার প্রণালীকে পচনরহিত করবার জন্য এত বেশী মনোযোগ দিতাম যে আমরা তাড়াতাড়ি অস্ত্রোপচার শেষ করতে ভুলে যেতাম।

পচনরহিত অস্ত্রোপচার করতে হ'লে যা সব চাইতে বেশী দরকার তা হচ্ছে চামড়াগুলি যাতে যথেষ্ট পরিষ্কার থাকে তার প্রতি নজর রাখা। অবশ্য যত চেষ্টাই করা হোক না কেন চামড়া সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করা খুবই শক্ত। আমি বলতে চাইছি চামড়া যেন পরিমিত পরিষ্কার থাকে এবং অস্ত্রচিকিৎসকের যেন এই সব বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকে।

আগেকার দিনের 'কিচেন সার্জ্জারির'র প্রধান অসুবিধা ছিল দু'টো। তখনকার দিনে অস্ত্রচিকিৎসককে দূর থেকে যেতে হত রোগীর কাছে এবং এই ধরনের শ্রান্তিকর পথকষ্টের পর অস্ত্রোপচার করার পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধারই সৃষ্টি হত।

আর একটি প্রধান বাধা হত 'অ্যানেসথেটিষ্ট'কে নিয়ে যখন রোগীকে সংজ্ঞাহীন করার প্রয়োজন হত। অর্দ্ধনিদ্রিত রোগীর দেহে একটি শক্ত

অস্ত্রোপচার করার চাইতে কষ্টকর বিষয় আর কিছুই ছিল না। আনাড়ির মত 'ইথার' প্রয়োগ করা হ'ত এবং কেবলমাত্র পেট সংক্রান্ত অস্ত্রোপচারের সময় 'ইথার' ব্যবহার করা হ'ত না। পেটের শক্ত চামড়ার অভ্যন্তর থেকে টিউমারকে দূর করার ব্যাপারটি ছিল যেন বেড়ার মধ্যে থেকে তরমুজ চুরি করারই মত এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে যৌবনের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট কাজে লাগত। রোগীকে 'ইথার' প্রয়োগ করে ভালভাবে ঘুম পাড়িয়ে ফেলবার জন্য 'অ্যানেসথেটিষ্ট'এর এক ঘণ্টা বা তার চাইতেও বেশী সময় লেগে যেত, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত 'অ্যানেসথেটিষ্ট' ঐ ধরনের কাজে ব্যস্ত থাকত সার্জেন অধীরভাবে তাঁকে আরও 'ইথার' প্রয়োগ করার জন্য উৎসাহিত করতেন।

এই ধরনের পরীক্ষার সময় আরও একটি অসুবিধা ভোগ করতে হত সহকারীর অভাবের জন্য। আনাড়ী সহকারীর প্রধান কাজই ছিল নিজেই অস্ত্রোপচার করার চেষ্টা করা। অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি রক্ষিত পাত্রটি সার্জেনের হাতে দেওয়ার পরিবর্ত্তে সে নিজের হাতেই ঐ পাত্রটি নিয়ে থাকত। সে অবশ্য ঐ পাত্রটির একটি প্রান্ত ধ'রে থাকত এবং সে যদি একজন সেরা বোকা হ'ত তাহ'লে সেই পাত্রটি উল্টে সার্জেনের মুখের উপর গিয়ে পড়ত।

এ ছাড়া অন্য এক ধরনে আনাড়ি সহকারীরা সার্জেনদের বিরক্ত করত—তা হচ্ছে যখন কোনও ক্ষতের গভীর অংশে ছুঁচ ঢুকিয়ে সার্জেন তা টেনে বের করবার জন্য চেষ্টা করতেন সহকারী স্পঞ্জ দিয়ে তৈরী কোমল বস্তুর এক তাল তাঁর হাতে গুঁজে দিত। এ দিয়ে ছুঁচ টেনে বার করা যেত না সেই জন্য সার্জেনকে ছুঁচ বার ক'রে নিয়ে আবার নতুন ক'রে কাজ সুরু করতে হ'ত। কাঁচি দিয়ে কয়েকটি মৃদু আঘাত ক'রে 'লিগেচার'টি কোথায় আছে তা নির্দ্ধারণ করার এইটিই ছিল রীতি। সহকারীর চূড়ান্ত বোকামী তখনই প্রকাশ পেত যখন এইভাবে

কাঁচি সার্জেনের হাতে দিতে গিয়ে তাঁর হাতে তা আনাড়ির মত বিঁধিয়ে দিত।

আজকাল সার্জেনরা যে ধরনের যন্ত্রপাতি পর পর ব্যবহার করবেন সেগুলো তাঁর হাতের কাছে এগিয়ে দেওয়া সহকারীরা এক অসম্মানকর ব্যাপার ব'লে মনে ক'রে থাকে। এই সব ক্ষেত্রে বাধা হচ্ছে দু'টি : প্রথম হচ্ছে সহকারী জানেই না সার্জেনরা কোন্ যন্ত্রপাতির পর কোন্ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবেন এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সার্জেনের হাতে হাতে যন্ত্র-পাতি এগিয়ে দেওয়ার অর্থই হচ্ছে তাঁর কাছে নতি স্বীকার করা। অবশ্য সার্জেন যখন নিজেই বিশেষ যন্ত্রটি নেবার জন্য হাত বাড়ান তখন সেটি তাঁর হাতে তুলে দিলে সহকারীদের সম্মান ক্ষুন্ন হয় না। এই থেকেই বোঝা যাবে যে সহকারীদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে পারলে তাঁরা সার্জেনদের কাজে লাগবে।

সহকারীকে যে ধরনের কাজ করতে হয় সেগুলো অভ্যাস করার চিন্তা কোনও সহকারীই করেন না, বিশেষ করে কাঁচিগুলো কিভাবে সার্জেনদের হাতে দিতে হয় তা লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজের ঘরে ব'সেও অভ্যাস করার কথা ভাবেন না।

আমি এই কারণেই এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করলাম যাতে আমি বোঝাতে পারি যে 'কিচেন সার্জারি'র অনেক সুবিধা আছে। এমন কি নম্র, বুদ্ধিমান এবং ভদ্র সহকারীও বোকা এবং আনাড়ির মত ব্যবহার করেন। একই সময়ে একই যন্ত্রপাতি নিয়ে নাড়াচাড়া করা একজনের পক্ষেই সম্ভব, এবং যখন সহকারী কিছু করে তখন অস্ত্র-চিকিৎসক নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকেন, অবশ্য তাঁর হাত দু'টোই নিশ্চল হ'য়ে থাকে কিন্তু মন তখন জটিল বিষয় চিন্তা করতে করতে বিব্রত হ'য়ে উঠে। কিন্তু কোনও সার্জেন যখন 'কিচেন-এর' মধ্যে কোনও রোগীর উপর একলা অস্ত্রোপচার করেন তখন তিনি নিজেই আগে ঠিক ঠিক জায়গায়

যন্ত্রপাতিগুলো গুছিয়ে রাখেন। পাত্রের উপর আগে থেকে তাঁকে নিজেকেই যন্ত্রপাতি সাজিয়ে রাখতে হয়,প্রয়োজন হ'লে তার উপর থেকে সেগুলো তিনি তুলে নেন এবং কাজ হ'লেই তিনি আবার সেগুলো ওর উপরে রেখে দেন। পাত্রটি দেড় ফুট আন্দাজ চওড়া এবং ঐটি তাঁর হাতের কাছেই থাকে। কাছে কোনও নার্স থাকে না, যাদের কাজই হচ্ছে ঐগুলো হাতে নিয়ে ঘষে ঘষে কাল্পনিক অথবা যথার্থ রক্তের দাগ তুলে ফেলা এবং তারপর ভুলবশতঃ অন্য কোনও জায়গায় রেখে দেওয়া।

যদি কোনও সাধারণ রোগের চিকিৎসাকারী কোনও চিকিৎসক সহকারীর কাজ করেন তাহ'লে তিনি নিজের মতে কোনও কিছু করতে ভয় পান—সার্জেনরা যদি কোনও চিমটে বা সাঁড়াশী তাঁকে ধ'রে থাকতে দেন তাহলেই তিনি খুব সন্তুষ্ট হন, এবং শিশুর হাতে ঝুমঝুমি দিলে সে যেমন শান্ত থাকে তেমনই তিনি শান্ত হয়ে থাকেন।

গ্রামাঞ্চলের সহকারীদের নিয়ে নতুন সমস্যা দেখা দিত কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সার্জেনদের সঙ্গে আগে তাঁদের দেখাশোনা বা পরিচয়ই থাকত না এবং প্রতি নূতন রোগীর ব্যাপারে সার্জেনদের নতুন পন্থা নির্দিষ্ট করতে হ'ত। রবারের দস্তানার ব্যবহার প্রচলিত হওয়ার পরও যখন সহকারীরা দস্তানা পরতে ভুলে যেত, আমি তা যেন লক্ষ্য করিনি এমন ভাণ করতাম, কিন্তু অস্ত্রোপচার সুরু হওয়ার আগে আমি তাঁদের দস্তানা প'রে নিতে বলতাম। ড্রেস-সার্ট পরা বা টাই লাগান যত সোজা এটি তত সোজা ছিল না বিশেষ করে প্রথমবার যখন দস্তানা পরবার চেষ্টা করা হ'ত তা মোটেই সোজা ছিল না এবং তার দস্তানা পরার আগেই অনেক ক্ষেত্রে আমি অস্ত্রোপচার শেষ করে ফেলতাম।

'কিচেন সারজারি'তে নানান ধরনের অস্ত্রোপচার করতে হ'ত। প্রতিটি অস্ত্রোপচারের বেলায় স্বতন্ত্র সমস্যা দেখা দিত, এবং প্রতিটি অস্ত্রোপচারই এক নতুন ধরনের অস্ত্রোপচার ব'লে মনে হ'ত। কিচেনের

মধ্যে অস্ত্রোপচার করার সময় এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি জাগত। সেখানে হুকুম তামিল করার চাইতে হুকুম দেওয়ারই সুযোগ থাকত। স্ত্রৈণ পুরুষ তাঁর স্ত্রীর শাসনের গণ্ডীর বাইরে চ'লে যাবার পর নিজস্ব কর্তৃত্বময় আবেষ্টনীর মধ্যে থাকার সময় 'হুজুর মহারাজ' ব'লে লোকেরা তাঁকে সম্বোধন করলে তিনি যে উত্তেজনা বোধ করেন সার্জেনরা কিচেনের মধ্যে অস্ত্রোপচারের সুযোগ পেলে তেমনই উত্তেজনা বোধ করতেন। কিচেনের মধ্যে অস্ত্রোপচার করার সময়ে যখন কেউ বলতেন "আমাকে এই জিনিষগুলো দাও" এবং তার উত্তর যখন আসত, "হ্যাঁ ডাক্তারবাবু দিচ্ছি" তখন খুব রোমাঞ্চ অনুভব করতেন এবং কাজ শেষ করতেন। ওর সঙ্গে আধুনিক অস্ত্রোপচার কক্ষের তুলনা ক'রে দেখুন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দিকে চেয়ে দেখলেই ত' ভয়ে জিব শুকিয়ে যায়। আধুনিক হাসপাতালের কেবলমাত্র স্টাফ-রুমেই বড় বড় কথা শোনা যায়। এখানে সকলেই সমান সাহসী এবং সমানই পারদর্শী।

আধুনিক হাসপাতালের একটি বড় প্রয়োজনীয়তা কিচেনের মধ্যে দেখা যায় না। অনভিজ্ঞ অস্ত্রচিকিৎসক কারুর ঘাড়েই দোষ চাপাতে পারেন না। যদি অস্ত্রোপচারের পর ক্ষত সংক্রামিত হয়ে পড়ে তার জন্য আধুনিক হাসপাতালে কখনই সার্জেনকে এর জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয় না। অস্ত্রোপচার কক্ষের বিশেষ ধরনকেই এর জন্য দায়ী করা হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ঐ ধরণের ক্রটী সংশোধন করা হয় নতুন একজন সহকারী নিয়োগ করে। সব চাইতে চমকপ্রদ আধুনিক কায়দা হচ্ছে সার্জেনের পিঠের উপর একটি পরিষ্কার তোয়ালে এঁটে রাখা। আমি কখনও কোনও সার্জেনকে কোনও ক্ষতের ওপর বসতে দেখিনি, আসল ব্যাপার হচ্ছে তাঁরা ক্ষতের উপর বসবার কোনও ইচ্ছা পোষণ করেন না, তা সত্ত্বেও যে-কোনও বিপদের জন্য সব সময়েই তৈরী থাকাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের লক্ষণ?

অ্যানাটমির চলিত রীতিবহির্ভূত যদি কোনও গণ্ডগোল দেখে সার্জেনরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন তাহ'লে তিনি আরও অন্য ধরনের যন্ত্রপাতি আনবার হুকুম দিতে পারেন, টেবিলকে ঘুরিয়ে অন্য ধরনে পাতাতে পারেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতা যদি বিশেষ আলোকপাত করতে না পারে তাহ'লে তা পুষিয়ে নেবার জন্য আরও বেশী অন্য আলোক দেওয়ার হুকুম দিতে পারেন। আমার বক্তব্য—অ্যানাটমির গণ্ডগোল হচ্ছে এমন এক অবস্থা যখন বিশেষ বিশেষ জিনিষগুলো সার্জেন চিনতে পারেন না। যে সমস্ত সার্জেনরা শবব্যবচ্ছেদের ঘরে কাজ করেছেন তাঁদের কাছে ঐ ধরনের কোনও সমস্যাই দেখা দেয় না।

কিচেন সার্জেনকে প্রথমেই যে কাজটি করতে হ'ত তা হচ্ছে যদি কোনও lesion থাকত যার জন্যে তাঁকে অস্ত্রোপচার করার জন্য ডাকা হয়েছিল তা খুঁজে বার করা। রোগীর সঙ্গে সার্জেনের পরিচয় না থাকার দরুণ ঐ পরিবারের চিকিৎসক তাঁকে নানা ভাবে সাহায্য করতেন। সবই নির্ভর করত ঐ পরিবারের চিকিৎসকের মতামতের উপর. তাঁর জ্ঞান সত্যই যদি বেশী থাকত তাহ'লে তার মত খুবই উপকারে লাগত, তা না হলে তাঁর মত ক্ষতিকরই হয়ে দাঁড়াত। যদিও সার্জেনের যথেষ্ট বিশ্বাস থাকত ঐ স্থানীয় চিকিৎসকের জ্ঞানের উপর তবুও তাঁর অস্ত্রোপচার কি ধরনে তিনি করবেন তার জন্য তাঁকে নিজেকেই রোগীর রোগ নির্ণয় করতে হত।

এ কথাটি মনে রাখতে বলি যে কিচেন সার্জ্জারি কেবলমাত্র চরম অঙ্গবিকৃতিমূলক অস্ত্রোপচার করার জন্য নয় পৃথিবীতে যত রকম রোগের জন্য অস্ত্রোপচার করা সম্ভব তা করা হ'ত। আসল কথা অনেক রোগীই যদি নিকটে কোনও হাসপাতাল থাকত সেখানে যেতে চাইত। কিন্তু অনেকের বেলায় যদিও কাছাকাছি হাসপাতাল থাকত তারা বাড়ীতে থেকেই চিকিৎসা করাতে চাইত, হাসপাতালে যাওয়া পছন্দ করত না।

আসলে ঐ ধরনের ভীতি যে অস্ত্রোপচারের ফলাফলকে অন্য রূপ দিতে পারে এ ধরনের বিষয়ের প্রতি কোনও মনোযোগই দেওয়া হয় নি। কি কারণে ভয় হয় তা নিয়ে মাথা ঘামানর প্রয়োজনই নেই। আজও আমি কোনও ভীত রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করতে রাজী হই না। আমি বহুবারই দেখেছি যে-সব রোগী ভবিষ্যৎ বাণী করেন যে তাঁরা আর সেরে উঠবেন না, তাঁরা তাঁদের ঐ বাক্য মিথ্যে হতে দেন নি। এই ধরনের কয়েকটি রোগীর মৃত্যুর পর তাঁদের শব-ব্যবচ্ছেদ ক'রে ময়না তদন্তের পরও মৃত্যুর কারণ জানা যায় নি। আমার বিশ্বাস তাঁদের চরম ভীতিই মৃত্যু ডেকে এনেছিল।

নানান খুঁটিনাটির সঙ্গে পরীক্ষা ক'রে দেখার পর নানান লক্ষণ দেখে রোগী কি রোগে আক্রান্ত হয়েছে তা নির্ণয় করা হ'লে, রান্নাঘরের স্টোভের উপর যন্ত্রপাতিগুলো ফুটিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর সার্জেন রোগীর কাছে দিয়ে এসে তাঁর ইতিহাস জেনে নেন এবং তাঁর পরীক্ষা শেষ করেন। ঐ কাজ শেষ করবার পরও যদি হাতে সময় থাকে তাহলে গোড়াতেই রোগীর মনে অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত যে ভয় ঢুকে থাকে তা দূর করবার জন্য সার্জেন চেষ্টা করেন। যখন সার্জেন তাঁর যন্ত্রপাতি ফোটাচ্ছিলেন তখন অস্ত্রোপচারের আগে একজন তরুণী পিয়ানো বাজিয়ে মনের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করে-ছিলেন। একজন মহিলা আমার সামনে গানও গেয়েছিলেন। আমার ধারণা তিনি ভেবেছিলেন ডাক্তারের সঙ্গে সহজভাবে ব্যবহার করার ঐটি একটি পন্থা বিশেষ। কখনও কখনও এমন এক একজন সুরসিক রোগী নিজেরাই শান-পাথর সঙ্গে নিয়ে আসতেন এবং যন্ত্রপাতি শান নিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ জানাতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁদের এই ধরনের অনুরোধ মঞ্জুর করা হত। এইগুলো হচ্ছে রঙ্গরসের চূড়ান্ত নিদর্শন। আজও ঐ সম্বন্ধে আমি একই ধারণা পোষণ করি।

দু'টি সাধারণ অবস্থার ভিত্তিতে অস্ত্রোপচারের তোড়জোড় করা হ'ত। একটি হচ্ছে, যে সব ক্ষেত্রে আগেই সিদ্ধান্ত করা হ'ত অস্ত্রোপচার করা হবে এবং সার্জেন এসে হাজির হওয়ার আগে যে সময় পাওয়া যেত তার মধ্যে যোগাড়-যন্ত্র এবং ব্যবস্থা করা হ'ত। হঠাৎ যে সমস্ত অস্ত্রোপচার করা হ'ত সে সমস্ত ক্ষেত্রে অবশ্য আগে থাকতে ব্যবস্থা করার কোনও সুযোগ পাওয়া যেত না।

প্রথমেই একটি আলো-বাতাস সম্পন্ন ঘর বেছে নেওয়া হ'ত। ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র এবং ছবিগুলো সরিয়ে নেওয়া হ'ত এবং ঘরের মেঝে আর দেওয়ালগুলি ঘসে ঘসে পরিষ্কার ক'রে রাখা হ'ত। অস্ত্রোপচারের সময় যাতে প্রতিবেশীরা জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে না পারে তার জন্য জানালার উপরে একটি টিনের পাত পেরেক দিয়ে এঁটে দেওয়া হ'ত। বিশেষভাবে এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হ'ত যখন Perineum সংক্রান্ত অস্ত্রোপচার করতে হত। তারপর এক ঘণ্টা বা তার চাইতে বেশী সময় যাবৎ জলের পাত্রগুলির মধ্যে অর্দ্ধেক জল রেখে ফোটান হত। চায়ের একটি বা দু'টি কেটলীও ঐভাবে ঠিক ক'রে রাখা হ'ত প্রথমেই এইভাবে জল ফোটাবার পর, জলপাত্রগুলি স্টোভের উপর থেকে সরিয়ে নেওয়া হ'ত এবং তাদের ঠাণ্ডা হ'তে দেওয়া হ'ত। এই ধরনের সমস্ত কার্য্যকলাপই আসল যে দিন অস্ত্রোপচার হবে তার আগের দিনেই করা হ'ত। কোনও কোনও ডাক্তারের কাছে অস্ত্রোপচার করার জন্য 'ফোল্ডিং টেবিল'ও থাকত। সার্জেন উপস্থিত হওয়ার আগের দিনই এগুলি তাঁরা রোগীর বাড়ীতে রেখে আসতেন।

সার্জেন উপস্থিত হবার পর আসল তোড়জোড় সুরু হ'ত। ছোট মুড়ে রাখা 'ফোল্ডিং' টেবিলটি পাতা হত। বৈঠকখানার টেবিলের উপর থেকে বাইবেল এবং ফোটোর এ্যালবামটি সরিয়ে নেওয়া হ'ত এবং ঐ টেবিলটি অস্ত্রোপচারের টেবিলের পাশেই রাখা হ'ত। সম্ভব

হ'লে আমি অনেক ক্ষেত্রেই হাসপাতালে যে ধরনের চাদর ব্যবহৃত হয় ঠিক ঐ ধরনের চাদর সঙ্গে নিয়ে যেতাম যাতে বৈঠকখানার বড় টেবিলটার উপর ঐ চাদর ঢাকা দিয়ে সেটিকে অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি সাজিয়ে রাখার উপযুক্ত একটি টেবিলে পরিণত করতে পারি। রোগীর জন্যও একখানি চাদর সঙ্গে রাখতাম এবং সার্জেনদের ও তাঁদের সহকারীদের ব্যবহারের জন্য গাউন নিয়ে যেতাম। স্পঞ্জ রোগীর গৃহেই পাওয়া যেত এবং পরবর্তীকালে দস্তানাও মিলত। যন্ত্রপাতিগুলো ভালভাবে ফোটানর পর ডিস-প্যান থেকে তুলে নেওয়া হ'ত এবং টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখা হ'ত—ইতিমধ্যে ঐ টেবিলটির উপর চাদর ঢাকা দিয়ে ঠিক ক'রেই রাখা হয়েছিল। এই সমস্ত করার পর, হাসপাতালের উপযোগী আবেষ্টনীই সৃষ্টি হ'ত। আর ভোগবিলাসের কথা বলতে হ'লে বলা যায়, মোটরে যাতায়াত প্রচলিত হবার পর সার্জেনরা মোটরে চেপে যে ঘরে রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করা হবে সোজা ঐ ঘরের জানলার কাছে গিয়ে গাড়ী থামাতেন। মোটরের হেড লাইটগুলো জেলে দেওয়া হ'ত এবং ঐ আলোর সামনে কোনও একটি সহকর্মী একটি আরসী ধ'রে রাখতেন যাতে ঐ আলো আরসীর উপর প্রতিফলিত হ'য়ে অস্ত্রোপচারের জায়গায় গিয়ে পড়ে। এর চাইতে আর ভাল আলো পাওয়া যেত না। অবশ্য ঐ সহকর্মীটি যদি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়তেন তাহ'লে অন্য একজনের সাহায্য নিতে হ'ত। এই ধরনের অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেত যদি গোড়া থেকেই আরসীটি ধরবার জন্য কোনও স্ত্রীলোক পাওয়া যেত। রক্ত দেখে বা অন্য কোনও কিছু দেখে স্ত্রীলোকেরা কদাচিৎ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে।

উপরোক্ত গৃহের সাজসরঞ্জামের সঙ্গে তুলনা করলে এমন অনেক গৃহ দেখতে পাওয়া যেত যেখানে অতি তুচ্ছ ধরনের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রও পাওয়া যেত না। প্রায়ই আমার কাছে কয়েকটি যন্ত্রপাতি ছাড়া

আর কিছুই থাকত না—এমন কি চাদরও থাকত না তার কারণ হচ্ছে হয়ত ভেবেছি কোনও জায়গায় অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হবে না সেইজন্য চাদর সঙ্গে রাখি নি বা হয়ত যে চাদর আমার সঙ্গে ছিল তা আমার ঐখানে পৌছানর আগে যে রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল সেখানেই ব্যবহৃত হয়ে গেছে।

এই ধরনের ক্ষেত্রে যদি জোড়া লাগাবার মত কোনও বাড়তি টেবিল পাওয়া যেত তাহলে তা আসল টেবিলটির পাশে পেতে দেওয়া হ'ত। এমন ভাবে টেবিলটি পাতা হ'ত যাতে রোগীকে ওর উপরে শুইয়ে দিলে সার্জেন এবং তার সহকারীর খুব কাছেই সে থাকত। যদি সার্জেনের সহকারী যথার্থ কাজের লোক হ'ত তাহ'লে অবশ্য এই ধরনের ব্যবস্থা খুব ভালই হ'ত। আর যদি সহকারীটি আনাড়ি ধরনের হ'ত তাহলে রোগীকে ডাক্তারের নিকটবর্ত্তী জায়গায় শোয়ান হ'ত এবং সহকারীকে তার উল্টো দিকে থাকতে বলা হ'ত—ঐখান থেকে সহকারীটি খুব বেশী ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করতে পারত না। যদি কোনও টেবিল না পাওয়া যেত তাহলে কবজা খুলে একটি দরজা বের ক'রে নেওয়া হ'ত এবং দু'টো বাক্সের উপর সেটি রেখে একটি টেবিল ধরনের জিনিষ তৈরি করে নেওয়া হ'ত। আমার মত লম্বা লোকের সুবিধার জন্য বাক্সর বদলে উঁচু উঁচু পিপের উপর দরজাটি রাখা হ'ত।

অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতিগুলো ঐ পরিবারের ডিস-প্যানের উপর রেখে ফুটিয়ে নেওয়া হ'ত। যদি ক্ষতস্থানের দেওয়ার মত জীবাণুমুক্ত কোনও 'গজ' পাওয়া না যেত তাহ'লে একটি তোয়ালে ঐ মাপে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে নেওয়া হ'ত এবং স্পঞ্জের পরিবর্ত্তে ঐগুলো ব্যবহার করা হ'ত এবং যন্ত্রপাতির সঙ্গে ওগুলোও ফুটিয়ে নেওয়া হ'ত। সাধারণতঃ একটি আস্ত তোয়ালেও অস্ত্রোপচারের জায়গায় বিছিয়ে রাখবার জন্য ফুটিয়ে নেওয়া হ'ত। তারপর ক্ষুর পাওয়া গেলে রোগীকে কামিয়ে দেওয়া হত।

তখনকার দিনে গালপাট্টা রাখার রীতি এত প্রচলিত ছিল যে, ঐ ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। এই সমস্ত ক্ষেত্রে চুলগুলি কাঁচি দিয়ে কেটে দেওয়া হ'ত এবং চুলের গোড়াগুলো বাড়ীর তৈরী ক্ষার-জলের সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে ধুয়ে দেওয়া হ'ত। কয়েকটি গৃহে হাতের কাছে 'গ্রীন' সাবান পাওয়া যেত এবং যখন বাহ্যপ্রস্রাবনালী সংলগ্ন স্থানে প্রয়োগ করা হ'ত তখন রোগীরা যন্ত্রণায় চীৎকার করে কাঁদত। অস্ত্রোপচার কক্ষে যে সমস্ত সূক্ষ্ম 'গ্রীন' সোপ ব্যবহার করা হ'ত এগুলো সে ধরণের সাবান নয়—ওগুলো হ'ত অল্প অল্প সবুজ রঙের এমন কড়া জিনিষ যা প্রয়োগ করলে—যে রোগীর উপর প্রয়োগ করা হ'ত তার প্রবল প্রতিবাদ ছাড়া—আর সব কিছু ধুয়ে উঠিয়ে দেওয়া যেত।

অস্ত্রোপচার শেষ হবার পর ক্ষতস্থানের যত্ন ও ড্রেসিং-এর প্রশ্ন দেখা দেয়। আজকাল যখন হাসপাতাল সমূহে অস্ত্রোপচার শেষ হবার পর যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয় দেখতে পাই তখন আমি ভাবি আজকালকার তরুণ চিকিৎসকেরা কতটুকুই বা অনুমান করতে পারেন তখনকার দিনে যখন রোগীদের অস্ত্রোপচারের পর একলা ফেলে রাখার জন্য তারা কত কষ্ট ভোগ করত। রোগীর জন্য যা কিছু করা হ'ত তাই তার ক্ষতি করত সে কথা আজ বলা আমার পক্ষে খুবই অন্যায়। তরুণ চিকিৎসক-দের কাছে পুরণো এই প্রবাদটিই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হত: "সন্দেহ হ'লেই রোগীকে Calomel (পারদঘটিত সাদা চূর্ণ বিশেষ) দাও।" আজকাল বলা হয় "সন্দেহ হ'লেই এক দেহ থেকে অন্য দেহে রক্ত সঞ্চারিত ক'রে দাও।" কিচেন সারজারি-র পাঠ যদি কোনও তরুণ সার্জেন গ্রহণ করেন তাহ'লে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। তখন তাঁরা বুঝবেন রোগীদের একলা ফেলে রাখলে তারা কি অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ায়।

আমার জীবনের প্রথম দিকে যখন আমি গ্রামাঞ্চলে গিয়ে চিকিৎসা

করতাম তখন আমি এক মৌলিক সত্য আবিষ্কার করি। রোগীর অন্ত্রের শেষ প্রান্ত বহু ছিদ্রযুক্ত হয় এবং এর সংশ্লিষ্ট রোগ উদরাবরক ঝিল্লীর স্ফীতির ফলে রোগটি বিশেষভাবে প্রসারিত হয়। প্যাথলজিষ্ট এবং সার্জেন হিসাবে যে অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করি তা' থেকে আমি বলতে পারি যে এই ধরনের সমস্ত রোগীই অস্ত্রোপচারের পর মারা পড়ে। আমি ঐ রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করি নি। মাস তিনেকের মধ্যে আমার সঙ্গে চিকিৎসকের দেখা হয় নি সেজন্য আমি ওই রোগীর কোনও খবরই পাই নি। মাস তিনেক পর আমার রোগী নিজেই আমার অফিসে এসে হাজির হ'ল এবং শান্তভাবে তার বিল চাইল। তাকে দেখে আমি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বললাম "তোমার কাছে আমার কিছুই পাওনা নেই।" আমি তাকে 'লাঞ্চ' খাওয়ালাম এবং একটি বল খেলা দেখতে নিয়ে গেলাম। কখন শরীরের উপর অস্ত্রোপচার না করলেই ভাল হয়, এ শিক্ষা আমি তার কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। স্ফীত অন্ত্রগুলি কেবল ওর নিকটবর্ত্তী জায়গাগুলিই আক্রান্ত করেছিল। আমি যদি ওর দেহের উপর অস্ত্রোপচার করতাম তাহ'লে প্রকৃতির গতিপথই রুদ্ধ করতাম।

একবার পথের উপর আমি যখন অস্ত্রোপচার করি তখন এক মজার ব্যাপার ঘটেছিল। এক হাঁপানী রোগীকে দেখবার জন্য আমাকে অনেক দূরে নিয়ে যাওয়া হয়। রোগীর অবস্থা তখন সঙ্কটজনক। স্থানীয় চিকিৎসকের রোগনির্ণয় করার ক্ষমতার উপর আমার আস্থা ছিল এবং আমি বেশ স্পষ্টই বুঝেছিলাম এই রোগীর উপর অস্ত্রোপচার করার কোনও প্রয়োজনই নেই। আমি দেখলাম রোগী সোজা হয়ে বসে আছে এবং অতি কষ্টে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের চেষ্টা করছে কিন্তু আমি কেবলমাত্র দৃষ্টিপাত করেই বুঝেছিলাম যে হাঁপানি ছাড়া অন্য কোনও রোগের জন্য ওর ঐ অবস্থা হয়েছে। সংক্ষেপে পরীক্ষা ক'রে

বুঝলাম যে বুকের গহ্বরের মধ্যে সম্পূর্ণ অদৃশ্যভাবে একটি গলগণ্ড হয়েছে। ঐ রোগীর বাড়ীতে ঘর ছিল মাত্র একখানি এবং ওখানে অস্ত্রোপচার করা মোটেই সুবিধা হ'ত না—এবং ওর ভিতরের দিকটাও অস্ত্রোপচার করার পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। সেইজন্য বাড়ীর উঠানে একটি আপেল গাছের তলায় অপারেশান টেবিল পাতা হ'ল। রান্না-ঘরের একটি কবাট কব্জা খুলে বের ক'রে নেওয়া হ'ল এবং দু'টো পিপের উপর রাখা হ'ল। একটি বাক্সর উপর যন্ত্রপাতি সাজিয়ে রাখা হ'ল এবং অপরটির উপর অস্ত্রচিকিৎসকের বসার ব্যবস্থা করা হ'ল। তার ঐ বিশেষ জায়গাটি অসাড় করা হলে ওখানে অস্ত্রোপচার করা হ'ল। গলগণ্ডটি যখন বার করা হ'ল তখন দেখা গেল যে আকৃতিতে ওটা একটা বেস্‌বলেরই অনুরূপ। আমার কাছে কয়েকটি ছোট ধরনের সাঁড়াশী ছিল এবং ঐ দিয়ে গলগণ্ডটিকে টেনে বের করা সম্ভব ছিল না। ঐ বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কি করব বসে ভাবছি এমন সময় মনে পড়ল কবে কোথায় যেন পড়েছি যে রোগী জোরে কাশলে কখনও কখনও গলগণ্ড বেরিয়ে আসে। সেইজন্য রোগীর বুকের পাঁজরের উপর আমি কনুই দিয়ে আস্তে আস্তে চাপ দিতে লাগলাম এবং ওকে কাশতে বললাম। এই ধরনের প্রক্রিয়া অবলম্বনের ফলে রোগীর শ্বাসনালীর উপর গলগণ্ডের চাপ একটু কম হয়ে এল এবং সে জোরে নিশ্বাস নিতে পারলে। তারপর তার চওড়া বুকটি যখন সঙ্কুচিত হয়ে এল তখন গলগণ্ডটিকে গলার ক্ষতের কাছ পর্য্যন্ত এগিয়ে আসতে দেখলাম। আমিও তৎক্ষণাৎ সেটিকে দু'হাত দিয়ে ধরে ফেললাম যেমন করে ছোট বয়সে বেস্‌বল ধরতে শিখেছিলাম। তখন আমি গলগণ্ডটি দু' হাতে ধ'রে বসে রইলাম এবং তারপর কি করব ভাবতে লাগলাম। তারপর আমি যন্ত্রপাতিগুলো ঠিক ক'রে নিলাম—একটি হাত গলগণ্ডের উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে নীচের

দিককার নালীটি আমার যন্ত্র দিয়ে চেপে ধরলাম। তারপরের ব্যাপার-গুলো সহজেই শেষ করা গেল। ঘটনাচক্রে ঐ রোগীটি আস্তে আস্তে সেরে উঠল।

আরও একটি রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করার সময় যা ঘটেছিল তা আমি চলিত একটি প্রবাদ-বাক্যকে কিছু অদল-বদল করে প্রকাশ করছি: অভিজ্ঞ সার্জেনরা যে সব জায়গায় ঢুকতে ভয় পায়, তরুণ সার্জেনরা পা টিপে টিপে সেখানে ঢুকে পড়ে। ঘটনাটি হচ্ছে এই ধরনের। গর্ভাশয়ে টিউমারে ভুগছে এমন একজন রোগিণী একটি খ্যাতনামা সার্জেনের উপদেশ চাইল। তিনি বললেন, ঐটির উপর অস্ত্রোপচার করা অসম্ভব। কথাটা সত্যি, মহিলার টিউমারটি এত বড় ছিল যার ওজন হবে প্রায় পঁচিশ সের। তার বুকের দু'পাশেই জলীয় পদার্থ জমেছিল এবং পাগুলো ফুলে উঠেছিল। রোগিণীটি প্রায় মাসের পর মাস শুয়ে ঘুমোতে পারে নি। যে সার্জেনের পরামর্শ সে নিয়েছিল তিনি বলেছিলেন যে ঐ রোগিণীটি প্রায় মাত্র কয়েক মাস বাঁচতে পারে। মহিলাটি বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং প্রবীন সার্জেন ওর রোগের অবস্থা দেখে তার সম্বন্ধে যা যা বলেছিলেন সে সবই আমাকে খুলে বলল। সে বললে ঐ ধরনের অস্ত্রোপচারের ফলে যদি হাজারে একটি রোগীরও বাঁচার সম্ভাবনা থাকে তাহ'লে তার দেহে যেন অস্ত্রোপচার করা হয়। সে ঐ অনিশ্চিত ফলের জন্য তৈরী, কেননা তার পাচটি সন্তানের জন্য তাকে বাঁচতেই হবে। তাকে আমি বললাম টিউমারটির উপর অবশ্য অস্ত্রোপচার করা চলে কিন্তু তার শরীরের সাধারণ স্বাস্থ্যের যে অবস্থা তাতে অস্ত্রোপচার করতে সাহস হয় না। সব কথা আলোচনা করবার পর সে আমাকে অস্ত্রো-পচারের জন্য তোড়জোড় করতে বলল এবং আশ্বাস দিয়ে বলল যে যদি অস্ত্রোপচারের ফল খুব খারাপও হয় তাহ'লেও আমি যেন দুঃখিত না

হই। এই চুক্তি হ'ল আমাদের মধ্যে। আমিও বললাম যে আমিও সকলকে জানিয়ে দিতে চাই যে এই ধরণের অসম্ভব অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে আমি কোনও ফী নিতে চাই না, এমনকি তার ফল ভাল হ'লেও নয়। আমি গোড়া থেকেই মনস্থির করে ফেলেছিলাম যে অসম্ভব ধরনের জটিল অস্ত্রোপচার করার ক্ষেত্রে আমি কোনও ফী নেব না। আমি ভেবে চিন্তে এই পন্থা আবিষ্কার করেছিলাম এই জন্য যে 'যদি ঐ ধরনের অস্ত্রোপচারের ফলে রোগীর মৃত্যু ঘটত তাহ'লে কেউ যেন না বলতে পারত যে সার্জেন আগে থাকতেই জানত যে এর ফলে রোগীর মৃত্যু হবে এবং জেনেশুনেই এই অস্ত্রোপচার করেছে কেবল-মাত্র ফী আদায় করার লোভে।

এই রোগিণীটিকে আমি যে ভাবে চিকিৎসা করেছিলাম তা বলছি। বুকের ছ'পাশেই যে তরল জিনিষ জমেছিল তা যন্ত্রের সাহায্যে নিষ্কাশন করলাম। এইভাবে তার পায়ের ফোলা কমিয়ে দিলাম। তার পেট এত বেশী ফুলে উঠেছিল যে সে অপারেশান টেবিলের উপর শুতে পারলে না। সে অপারেশান টেলিলের উপর বসল এবং ছু পাশে ছুটো পা ছড়িয়ে দিল। আমি তার ছুই উরুর মাঝামাঝি জায়গায় বসলাম এবং যেখানটিতে অস্ত্রোপচার করব সেই জায়গাটি অসাড় ক'রে অস্ত্রোপচার স্থরু করলাম। টিউমারটি অল্প অল্প শক্ত হয়ে উঠেছিল—যেন জেলির একটি তাল। টিউমারের উপর দিকটা ছিল ইঞ্চি ছয়েক লম্বা। ওর খানিকটা আমি কেটে দিলাম। তারপর ওটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে আরও খানিকটা অংশ কেটে দিলাম। এইভাবে কাটতে কাটতে সমস্ত টিউমারটি কাটা শেষ করলাম। সমস্ত ব্যাপারটি শেষ করতে ছ' ঘণ্টা সময় লাগল। সেও সঙ্গে সঙ্গে বলল যে বহু বৎসর পরে এই প্রথম সে গভীরভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারছে। সে খুব আরামেই শুয়ে পড়তে পারল।

আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম পরের দিনে যখন আমি ওখানে গিয়ে দেখলাম

যে টেবিলে ব'সে শান্তভাবে সে একটি চিঠি লিখছে। তার কাছে তদারক করার জন্য কোনও নার্স'ও ছিল না। তারপর সে আস্তে আস্তে সেরে উঠল।

আমার আর একটি অস্ত্রোপচারের কথা মনে পড়ছে যার মধ্যে কয়েকটি শিক্ষনীয় বিষয় আমি লক্ষ্য করি। কোনটি সব চাইতে প্রয়োজনীয় তা অবশ্য ব্যক্তিগত মতামতের উপর নির্ভর করবে। একজন অল্পবিস্তর খ্যাতিসম্পন্ন এক মুষ্টিযোদ্ধার শরীরে অস্ত্রোপচার করা প্রয়োজন হয়েছিল—সে কিন্তু হাসপাতালে যেতে ভয় পাচ্ছিল। সেই জন্য আগে যে ভাবে বর্ণনা করেছি সেইভাবেই একটি খাবার টেবিলকে অপারেশান টেবিলে রূপান্তরিত করা হ'ল। যখন তাকে সংজ্ঞাহীন করার চেষ্টা করা হচ্ছিল তখন ঐ বিরাটদেহ মুষ্টিযোদ্ধা বেশ জোরে জোরে হাত পা ছুঁড়তে সুরু করে দিল। টেবিলটি হুড়মুড় ক'রে ভেঙ্গে পড়ল। অর্দ্ধ অচৈতন্য রোগী মেঝের উপর প'ড়ে গেল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে এমন ভঙ্গীতে দাঁড়াল যেন ঐ মুষ্টিযোদ্ধা কোনও খবরের কাগজের রিপোর্টারের সামনে ফোটো তোলার জন্য দাঁড়িয়েছে। আমি যেন তার কাল্পনিক প্রতিদ্বন্দী। আমারও মাথায় এক বুদ্ধি এল। আমার পিছনে একটি দরজা ছিল, তাতে একটি পর্দা টাঙ্গান ছিল—এবং ঐ দরজার মধ্যে দিয়ে চারপাশ রেলিঙ দিয়ে ঘেরা একটি বারান্দায় যাওয়া যেত। দরজাটি অর্গলবদ্ধ ছিল—আমি খিল খুলে বারান্দায় গিয়ে পড়লাম এবং চার ফিট নীচের মাটিতে লাফিয়ে পড়লাম। ঐ অর্দ্ধ-অচৈতন্য মুষ্টিযোদ্ধাকে দেখলে ভয় হয়। একবার আমি এক পাগলা ষাঁড়ের সামনে পড়েছিলাম, কিন্তু এই খ্যাতনামা মুষ্টিযোদ্ধার তুলনায় সে ছিল একটি নম্রপ্রকৃতির ষাঁড়। বিশ্বাস করুন আর না করুন, 'ইথার'র ঘোর একটু কেটে যাবার পর ঐ পরিবারের চিকিৎসক অনেক অনুনয়-বিনয় ক'রে তাকে আবার বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলে।

আবার তার উপর ইথার প্রয়োগ করা হ'ল এবং আমি অস্ত্রোপচার সুরু করলাম। বলা বাহুল্য আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম এবং দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলাম এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বুঝতে পারলাম যে সে ইথার-এর ঘোরে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন হয়েছে ততক্ষণ অপেক্ষা করলাম।

প্রবাদ আছে নতুন শিক্ষার্থীদের প্রতি নিয়তি সদয়। আমার ব্যাপারে এই প্রবাদটি বিশেষ ক'রে খুবই খাটে। আমি যাদের কোনও দিনই আগে দেখি নি এমন অনেক রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করেছি—তারা অবশ্য আগে থাকতে কোনও তোড়জোড়ই করে নি।

রাস্তার উপর আমি যে সমস্ত অস্ত্রোপচার করি তাদের বেশীর ভাগই হচ্ছে হাসপাতালে সাধারণতঃ যে সব ধরনের অস্ত্রোপচার করা হয় তাদেরই অনুরূপ। যেমন টিউমার সংক্রান্ত কুক্ষির উপর নানান ধরনের অস্ত্রোপচার এবং কাটা সেলাই করে জুড়ে দেওয়া—এ ছাড়া ক্যানসারের জন্য বুকের উপর অস্ত্রোপচার এবং ক্যানসার ব'লে ভুলে ক'রে শরীরের মধ্যের পুঁজ অস্ত্রোপচার ক'রে নির্গত ক'রে দেওয়া। মস্তিষ্কের মধ্যে ফোড়া কেটে পুঁজ বার ক'রে দিই এবং এ ছাড়া অনেক mastoid অপারেশনও করি একজন টাইফয়েড জ্বরাক্রান্ত শয্যাশায়ী রোগীর উপর তার বিশেষ অঙ্গটি সংজ্ঞাহীন ক'রে দেবার পর। সে ক্রমে ক্রমে সেরে উঠে। আসল কথা আমি কিচেন সার্জারি শাস্ত্রে যত রকমের অস্ত্রোপচারের বিষয় আছে সব রকমেরই অস্ত্রোপচার করেছি। তখন আমি ভয় পেতাম না। এখন কিন্তু ঐ ধরনের আবেষ্টনীতে ঐ সব ধরনের অস্ত্রোপচার করতে আমি রাজী হব না। এটি একটি বিচিত্র অনুভূতি। আমি কোনদিনই কোনও অস্ত্রোপচার করতে ভয় পাই নি আজও ভয় পাই না—কিন্তু যখনই কোনও জটিল অস্ত্রোপচার করবার জন্য ডাক পড়ে তখন যে অভিজ্ঞ সহকারী বিশ বছর আমার

পাশে থেকে সাহায্য করেছে তাকে আমার পাশে পেলে নিশ্চিন্ত মনে অস্ত্রোপচার করতে পারি। আমার অনুমানে এটা হচ্ছে একটা পূর্ব্বাভাস যে ভবিষ্যতে কোনও দিনে যারা আজ আমাকে ছায়ার মত অনুসরণ করছে তাদেরই হাতে আমার অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতিগুলো দিয়ে যাব।

দশম পরিচ্ছেদ

এক কথায় বলতে গেলে, এক সময়ে ক্যানসাস সহরে সরকারী সাহায্য না নিয়েও অনেকগুলি হাসপাতাল গড়ে উঠেছিল। মাথা পিছু হাসপাতালের সংখ্যা বেশীই ছিল—অর্থাৎ আরও স্পষ্ট ক'রে বলতে হয় হাসপাতালের চাইতে রোগীর সংখ্যা কম ছিল—পৃথিবীর অন্য কোনও জায়গায় এই রকম ছিল না। স্বাভাবিক ভাবেই সরকারী সাহায্য না নিয়েই এতগুলো হাসপাতাল গ'ড়ে উঠেছিল। আমি অনেক লোককেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম এত হাসপাতাল ক'রে তারা হয়রাণ কেন হয়েছে। কেউই কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নি।

আমার মনে হয় ঐ প্রশ্নের জবাব দিতে হ'লে আমাকে এক নতুন সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে। এই সমস্যাটি আলোচনা করতে হ'লে দু'টো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে।

এর মধ্যে একটি ব্যাপার আছে যা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এই ধরনের সমস্ত প্রচেষ্টার পিছনেই ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি আছে—বা এমন একটি জিনিষ থাকে যার মধ্যে আশা করা যায় যে পরে এই প্রচেষ্টা ব্যবসা হিসাবে সাফল্য লাভ করবে। চিকিৎসকেরা অবশ্য স্পষ্টাস্পষ্টিভাবে এ কথা স্বীকার করতে পারেন না। কোনও হাসপাতালই চিকিৎসকদের ন্যায্যমত টাকা দিতে পারে না। চিকিৎসকেরা ক্রমে ক্রমে তাঁদের

পশার জমিয়ে ফেলবেন এবং তার ফলে যা টাকা পাবেন তাতে হাসপাতাল থেকে টাকা না পেলেও কিছুই এসে যাবে না। টাকা রোজগারের পরই যা মানুষ বেশী ক'রে চায় তা হচ্ছে গৌরব-প্রচার। হাসপাতালের স্বত্বাধিকারীরা ভাবেন যে এই প্রচেষ্টা থেকে তাঁরা যথেষ্ট লাভ করবেন অর্থাৎ কি না রাজমুকুট লাভ করবেন। চলিত কথামত বলতে হলে বলা যায় ফুলে যেমন কাঁটা থাকে তেমনি রাজমুকুট পরতে হলে ঝঞ্ঝাটও ঘাড়ে নিতে হবে—এ সব ক্ষেত্রে ঝঞ্ঝাটও থাকত অনেক।

যতদূর আমার মনে পড়ে তা থেকে আমি এ কথাই বলতে পারি যে আমার বেলায় আসল ব্যাপার ছিল এই ধরনের: যদিও আমি অস্ত্র-চিকিৎসা বিষয়ে পাঠ নিয়েছিলাম তবু আমাকে এই সত্যের সম্মুখীন হতে হয়েছিল যে হাতে রোগী না পেলে সার্জেন হওয়া যায় না। আমি কয়েকটি বাড়ীতে যদিও অস্ত্রোপচার করেছিলাম তবুও আমার মনে হত যে, কোনও হাসপাতালে কাজ করার সুযোগ পেলে সার্জেন হিসাবে আমার পশার জমাতে পারতাম। অন্ততপক্ষে আমার অনেক সহকর্মীই এই ধরনে চিন্তা করত, তা তাঁদের হাসপাতাল গ'ড়ে তোলবার প্রচেষ্টা দেখলেই বোঝা যাবে। এটা নিশ্চিন্ত ক'রে বলতে পারি এমন একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলবার ইচ্ছা আমার একটুও ছিল না যাতে আমার পরিণত বয়সের সমস্ত চিন্তা ঐ প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য কেন্দ্রীভূত করতে হবে এবং আমার চিকিৎসাবৃত্তির প্রতি মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হবে না। তখনকার দিনের কথা মনে হ'লে আমি বলতে পারি যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সহরে আমার পশার জমে উঠছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত যা রোজগার হয় তাতে দু'বেলা দু' মুঠো খেতে পাওয়া যায় মাত্র।

সাধারণ ভাবে বলা যায়, এখন যে কথা আমি বলতে চাই তা বোঝাতে হ'লে হাসপাতাল গ'ড়ে তোলবার হিড়িক সুরু হবার আগে যে সমস্ত হাসপাতাল ছিল তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করলে উপকার হবে।

পঞ্চাশ বছর আগে কেবলমাত্র বড় বড় সহরেই হাসপাতাল ছিল। তড়িক-ঘড়িক চিকিৎসা করার প্রয়োজন হ'লে গ্রামের চিকিৎসকদের ডাকা হ'ত এবং তখনকার দিনে দুর্ঘটনার ফলে যে সমস্ত আহত ব্যক্তির চিকিৎসা করার প্রয়োজন হ'ত গ্রামের চিকিৎসকেরা তাদেরই চিকিৎসা করতেন। তখনকার দিনে যানবাহনের এতই অসুবিধা ছিল যে গ্রামের রোগীদের হাসপাতালে যেতে হ'লে অনেক দূর পথই অতিক্রম করতে হ'ত। উদাহরণ স্বরূপ, হয়ত ঐ জায়গাটি হাসপাতাল থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে ছিল, এবং রাস্তা যদি ভাল পাওয়া যেত তাহলে ঐ দূর পথ অতিক্রম করতে অন্ততপক্ষে পাঁচ ঘণ্টা সময় লেগে যেত। আর পথ যদি খারাপ থাকত তাহ'লে আরও বেশী সময় লাগত। ঐ রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করতে হবে—ডাক্তারবাবুর এই নির্দেশটি পরিবারের লোকেরা যতক্ষণে বিচার করে দেখবার জন্য সমবেত হতেন ততক্ষণে রোগীর জীবনের বেশ কয়েকটি মূল্যবান ঘণ্টা কেটে যেত। এই ধরনের বিলম্বের জন্যই অস্ত্রোপচারের পর রোগীদের মৃত্যুর হার এত বেশী হত। যতই নানান ধরণের রোগ সার্জেনদের চিকিৎসার গণ্ডীর মধ্যে আসতে লাগল ততই আরোও বেশী হাসপাতাল সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা লোকে উপলব্ধি করতে লাগল।

ব্যক্তিগত জীবনে ডাক্তারদের নিজস্ব ছোট ছোট হাসপাতাল বা ক্লিনিক রাখতে পারলে একটি বিশেষ সুবিধা হ'ত—ঐ অঞ্চলে যে সমস্ত চিকিৎসকের ঐ ধরনের ক্লিনিক থাকত না, তাদের মধ্যে যার ক্লিনিক আছে তার খাতির অনেক বেড়ে যেত এবং তার ফলে উচ্চাশাহীন অনেক চিকিৎসকের অনেক রোগী যে সমস্ত চিকিৎসকের হাসপাতাল আছে তাদের চিকিৎসাধীন হতে বেশী চাইত। রোগীদের ঐ ধরনের ব্যবহার অবশ্য একেবারে যে সমর্থন করা যেত না তা নয়, কারণ যাঁরা ক্লিনিক খুলেছিলেন তাঁরা যে যথেষ্ট উচ্চাভিলাষী তা' তাঁদের

ক্লিনিক খোলার প্রচেষ্টা দেখলেই বোঝা যেত এবং রোগীরা ভাবত তাদের জ্ঞানও বোধ হয় অন্যদের চাইতে বেশী—এবং বোধ হয় কেন বাস্তবিকই কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান একজন সাধারণ ডাক্তারের চাইতে অনেক বেশীই থাকত।

চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এই সমস্ত ছোট ছোট হাসপাতাল গ'ড়ে তোলার আসল উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন তাঁরা ঔষধ-বিজ্ঞানের ইতিহাস সৃষ্টির ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। উচ্চাভিলাষী ডাক্তারদের ভালভাবে কাজ করতে দেবার জন্য ঐ হাসপাতালগুলো অনেক সুযোগ-সুবিধা ক'রে দিত এবং ওদের মাঝখান থেকেই অনেক খ্যাতনামা সার্জেন বেরিয়েছেন। এ কথা খুব জোর ক'রে বলা চলে না যে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করালে রোগীরা তাদের আড়ষ্টভাব কাটিয়ে উঠতে পারে। হাসপাতালে তারা যেত সামান্য রোগের হাত থেকে আরাম পাবে ব'লে কোনও জটিল রোগ সুরু হবার প্রথম দিকেও তারা হাসপাতালে যেতে চাইত। রোগীরা অনেক বেশী পছন্দ করত তাদের নিজের বাড়ীতে বন্ধুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এবং পরিচিত চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে থাকতে। তারা বহু দূরপথ অতিক্রম ক'রে সহরে গিয়ে অপরিচিত আবেষ্টনীর মধ্যে এবং নতুন ডাক্তারের চিকিৎসাধীন হয়ে থাকতে পছন্দ করত না। রোগীরা যত শীঘ্র মনস্থির ক'রে ফেলত এবং অস্ত্রোপচার করার অনুমতি দিত ততই মৃত্যুর হার কমত এবং তার ফলে লোকের মন থেকে হাসপাতাল-ভীতিও কিছু কমে যেত।

আমার নতুন প্রচেষ্টার প্রারম্ভে আমার ইচ্ছা ছিল আমি ছত্রিশ ফিট চওড়া এবং পঞ্চাশ ফিট লম্বা একটি বাড়ী তৈরী করাব। ঐ বাড়ীর মধ্যে পাঁচটি ভাল ভাল ঘর থাকবে। এখানে রোগীদের দেহে অস্ত্রোপচার করা হবে এবং চারটি তলাতেও পাঁচটি ঘর থাকবে। ভালভাবে পরীক্ষার জন্য রোগীদের এখানে আনা হ'বে। এই ধরনের একটি বাড়ী

তৈরী হ'ল তবে সেটি কাঠের তৈরী। ওর মধ্যে গরম হাওয়া সৃষ্টি করার একটি চুল্লী ছিল, স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠান ঐ চুল্লীটি ওখানে বসিয়েছিল কিন্তু ওটি নির্ম্মাণের সময় কিছু ত্রুটি থেকে গিয়েছিল। ফলে একদিনও ওটা কাজ করে নি। উপরন্তু যাঁর কাছ থেকে আমি ওটি কিনেছিলাম তাঁরই লম্বা চওড়া কথার বেশ গরম হাওয়া উপভোগ করতে হয়েছিল।

মাটির তলায় একটি চৌবাচ্ছা তৈয়ারী করান হয়েছিল এবং ওর মধ্যে হস্তচালিত পাম্পের সাহায্যে জল ভর্ত্তি করা হত, এবং জলের চাপ এত বেশী হত যে আপনিই জল অস্ত্রোপচার কক্ষ পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারত।

দ্বিতীয় তলায় অস্ত্রোপচার কক্ষ ছাড়াও রান্নাঘর, খাবার ঘর এবং একটি বা দু'টি শোবার ঘরও ছিল। অস্ত্রোপচার কক্ষের মেঝে ছিল টালি দিয়ে তৈরী, এটা আমার একটি গর্ব্বের বিষয় ছিল। ঐ অঞ্চলের অন্যান্য হাসপাতালে এই ধারনের সাজ-সরঞ্জাম ছিল না। স্থানীয় এক মিস্ত্রী ঐ টালিগুলো বসিয়েছিলেন এবং ঐ ছোট ছোট ছ-কোণা টালিগুলোকে আটকে রাখবার জন্য সিমেণ্ট ব্যবহার করার পরিবর্ত্তে "গরম হাওয়া" ব্যবহার করা হয়েছিল। সে কখনই টালি পাততেও দেখে নি কিন্তু তার ধারণা ছিল যে সে ও কাজ করতে পারবে। তার ফল এই হল যে, যখন কেউ মেঝের ওপর দিয়ে হেঁটে যেত, খোলা টালির টুকরোগুলো মেঝে থেকে উঠে পড়ত, সেই জন্য বাধ্য হয়ে সহর থেকে আর একজন মিস্ত্রীকে ডাকতে হল এবং ওকে দিয়ে ঠিকভাবে টালিগুলো বসিয়ে নিলাম।

আমাদের একটি স্বল্প-চাপবিশিষ্ট বাষ্পচালিত জীবাণুমুক্ত করার যন্ত্র ছিল, ওর দাম পড়েছিল ষাট ডলার। স্থানীয় টিনের দোকান থেকে একটি টিনের পাত্র কিনেছিলাম। এর উপর রেখে যন্ত্রপাতি এবং দস্তানা ফুটিয়ে নেওয়া হত। ওর দাম পড়েছিল দু'ডলার। জীবাণুমুক্ত করার কক্ষটিতে ঐগুলোই ছিল সম্পূর্ণ সাজ-সরঞ্জাম। ঐ সংক্রান্ত খরচাগুলো

যোগ করলে মোট দাঁড়ায় বাষট্টি ডলার। এই বিষয়টি লক্ষ্য করতে বলি : জীবাণুমুক্ত করার কাজ ওর সাহায্যে নিখুঁত ভাবেই হত, আজকালকার আধুনিক ধরনে নির্ম্মিত সাজ-সরঞ্জামের সাহায্যে যে ধরনে কাজ করা হয় ওর কাজ তার চাইতে কোনও অংশে নিকৃষ্টতর নয়। হাসবেন না যেন! সুষ্ঠুভাবে বহুদিন যাবৎ ওর দ্বারা কাজ পাওয়া গিয়েছে কিন্তু ব্যবহার করার সময় বড় বেয়াড়াধরনের ব'লে মনে হত।

লিফ্‌ট্ বসাবার জন্য খানিকটা জায়গা রাখা হয়েছিল—হয়ত ভবিষ্যতে কোনও দিন ঐ স্বপ্ন সফল হবে এই আশা ছিল। ইত্যবসরে যে সমস্ত রোগী এত দুর্ব্বল ছিল যে হেঁটে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারত না তাদের বহন করে উপরে নিয়ে যাওয়া হত সেটা ছিল একটা বাস্তব ব্যাপার, কল্পনা নয়। হাসপাতালের জন্য আনুমানিক খরচ হবে আশা করেছিলাম চার হাজার ডলার কিন্তু আসলে খরচ হয় ছ'হাজার ডলার।

অতঃপর বাড়ী তৈরী শেষ হয়ে গেল এবং আমরাও ধাক্কা খেতে খেতে কয়েকটা বছর কাটিয়ে দিলাম। অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছল্য যথেষ্ট ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করেছিল, তা ছাড়া জটিলতর ঝঞ্ঝাট ভবিষ্যতের গর্ভে আমার জন্য তোলা ছিল। আমার বিপদের সঙ্গে তুলনা করলে মনে হয় 'জোবের' দুঃখ কষ্টও আমার চাইতে অনেক কম ছিল। কোনও দিনই আমার শরীর খুব বলিষ্ঠ ছিল না এবং নানান রকম রোগও ভোগ করতে হয়েছিল। তখনকার দিনে সে সমস্ত রোগের নামও আবিষ্কৃত হয় নি। আমার যখন বিপদ আসত তখন হাসপাতালেরও ক্ষতি হত। কয়েকটি দুর্ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করছি। আমার বাঁ হাতের মাঝের আঙ্গুলে একটি টিউমার হয়েছিল। আঙ্গুলটিকে অসাড় ক'রে আমি নিজেই ওর উপর অস্ত্রোপচার করলাম। টিউমারটি অস্থি-মাংস সংযোজক শিরার দেড় ইঞ্চি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শ্লাইডে ধরা পড়ল টিউবারকলোসিস হয়েছে। একটি অস্থি-মাংস সংযোজক শিরার পূর্ব্বা-

বস্থা ফিরে পাওয়ার সময় যে কি যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় সে অভিজ্ঞতা আমার আছে। আঙ্গুলটি সামান্য একটু নাড়লেই বিদ্যুতের শক্ খেলে যেমন কষ্ট হয় তেমনিই তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করতাম। টিউমারটিকে দূরীভূত করবার পর দু'সপ্তাহ অন্তর অন্তর আঙ্গুলের মধ্যে আয়োডোফর্ম গ্লিসারিণ ইনজেকসান দিতে হত—মোট বারোটি ইনজেকসান দিতে হয়। এক একবার ইনজেকসান নেবার পর হাতটি ধ'রে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা যাবৎ পায়চারি করে বেড়াতে হত। কমজোরী যাতনা-নিবারক ঔষধ প্রয়োগে কোন ফলই পাওয়া যেত না এবং মরফিন ব্যবহার করতেও আমার সাহস হত না। আমার সেরে উঠতে ন' মাস সময় লাগল এবং তারপর কোনও কষ্ট ভোগ না ক'রেই আমি দু'টো হাত দিয়েই কাজ করতে পারতাম। যখন আমি আঙ্গুলের জন্য ভুগছিলাম তখন যে সমস্ত অস্ত্রোপচার এক হাতেই করা সম্ভব কেবলমাত্র সেইগুলিই আমি করতাম সুতরাং হাসপাতালের আয় প্রায় ছিল না বললেই হয়।

এই রোগ থেকে সেরে উঠবার পর আমি কয়েকমাস বেশ কাজ করি তারপর আবার সর্ব্বরোগের মধ্যে নিকৃষ্টতম রোগ গ্রন্থিসম্বন্ধীয় চরম বাতরোগে আক্রান্ত হয়ে পঙ্গু হয়ে পড়ি। মানুষের শরীরে যত রকম যন্ত্রণা পাওয়া সম্ভব—এবং আমি নিজে শরীরের নানান যন্ত্রণাও ভোগ করেছি—তাদের মধ্যে সব চাইতে বেশী কষ্টকর হচ্ছে আমি বলব এই রোগের প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা কাল।

তারপরের অভিজ্ঞতাগুলো খুবই দুঃখময়। আমি কাজ করার শক্তি হারিয়েছিলাম সেজন্য অর্থাগম প্রায় ছিল না বললেই হয় আমি প্রায় ডুবতেই বসেছিলাম। সেইজন্য যখন আমি রোগে ভুগছিলাম সেই অবস্থাতেই আমার হাসপাতালে যা কিছু সামান্য সাজ-সরঞ্জামাদি ছিল তা হস্তান্তরিত করতে বাধ্য হই। এটি একটি বিশেষ কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল কারণ হাসপাতালে আমার সরঞ্জামাদি এত অল্প ছিল যে যারা

হাসপাতাল থেকে টাকা রোজগারের ইচ্ছা পোষণ করত তাদের তা মোটেই আকৃষ্ট করতে পারে নি। আমার সমাজকে বহু বৎসর যাবৎ আমার যা কিছু ছিল সবই দিয়েছি এবং ঐ ধরনের কার্য্যকলাপের ফল মৃত্যু এইটিই আমার ধারণা হয়েছিল।

দীর্ঘ সপ্তাহের পর সপ্তাহ ব্যাপী যখন আমি এই বাতরোগের কবলে ভুগছিলাম তখন কেবলমাত্র আমার বিশ্বস্ত নার্স টিই আমার পাশে ছিল। —সে খুব ভাল ক'রেই জানত যে যদিও আমি বেঁচে উঠি, তাকে টাকা দিতে পারব কি না সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল এবং আমার মৃত্যু হলে তো তাকে টাকা দেবার আর কেউই ছিল না।

সবেমাত্র বাত থেকে সেরে উঠেছি এমন সময়ে দেখা গেল আমার বাম ফুসফুসটি যক্ষ্মাক্রান্ত হয়েছে। আমার একজন পুরণো শিক্ষক আমাকে বরাবরের জন্য দক্ষিণ পশ্চিমে গিয়ে বসবাস করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। তাঁর মতে এর পরও যদি আমি কাজ করতাম তাহ'লে মৃত্যুর হাত এড়ান আমার পক্ষে শক্ত হয়ে উঠবে। আমি বললাম—বেশ তাই হোক, মৃত্যুই আসুক। আমি কখনই যুদ্ধ থেকে ক্ষান্ত হবার জন্য নানান যুক্তির অবতারণা করি না।

প্রায় সকলেই আমার কাজে বাধা দিল, তা সত্ত্বেও ক্রমে ক্রমে আমার পশার জমে উঠল এবং ১৯১৬ সালে যথার্থ পরিকল্পনানুযায়ী আমার নিজের একটি অগ্নিরোধক বাড়ী তৈরী করাতে সমর্থ হলাম। বাড়ী তৈরী শেষ হবার আগেই তা রোগীতে ভর্ত্তি হয়ে গেল এবং শীঘ্রই আরও একখানি নতুন বাড়ী তৈরী করাতে হল। তখন আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন।

এ ছাড়া আরও দু'টি নতুন বাড়ী এবং নার্সদের একটি বাসস্থানও তৈরী করান হল, একটি চতুষ্কোণ জমিতে সব বাড়ীগুলো তোলা হল, কিন্তু বাড়ীগুলো পাশাপাশি সাজান হলে তার দৈর্ঘ্য হত ৫৭৬ ফীট।

শেষকালে একটি বড় হাসপাতাল গড়ে উঠল—আনুমানিক দু'শো রোগীর থাকার ব্যবস্থা ওতে ছিল এবং নার্সদের জন্য যে বাসস্থান তৈরী করান হল তাতে প্রায় একশ' জন নার্স থাকতে পারত।

রোগনির্ণয় করার পন্থার দ্রুত উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের সাজ-সরঞ্জামাদি শীঘ্র বাড়িয়ে ফেলার খুব প্রয়োজন বোধ করলাম। যে সমস্ত রোগীকে রঞ্জন রশ্মি বা কোনও ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা ক'রে দেখার প্রয়োজন হত তাদের সেই সমস্ত হাসপাতালেই নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখা সম্ভব হত, যেখানে ঐ সকল পরীক্ষা করে দেখার জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম থাকত। বিশেষ ভাবে বিশেষ রোগের চিকিৎসা করার ধারা এত দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে এগিয়েছিল যে খুব ভালভাবে একজন রোগীকে পরীক্ষা ক'রে দেখতে হ'লে বেশ কয়েকজন চিকিৎসকের প্রয়োজন হত। এর অর্থ হচ্ছে হাসপাতালে চিকিৎসকদের সংখ্যা বাড়ান। সেইজন্য রোগীর পক্ষে কোনও একটি ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠানে গিয়ে সব রকমের সাহায্য পাওয়ার পক্ষে সহজ—ঘুরে ঘুরে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষা করানর চাইতে পূর্ব্বোক্ত মতে একটি সর্ব্বসুবিধা সম্মত ক্লিনিকে যাওয়া সুবিবেচকেরই কাজ। এই ধরনের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিকে বলা হয় ক্লিনিক। এগুলি কোনও হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট বা বাইরেও পৃথক ভাবেও থাকতে পারে।

প্রথমে কাজ সুরু হয় একজন মাত্র সহকারী নিয়ে এবং পরে কাজ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সময় সময় বারো জন কিম্বা আঠার জন পর্য্যন্ত পুরুষ বা মহিলা নিযুক্ত করতে হত। কখনও কখনও ডাক্তারের সংখ্যা আরও বাড়ানর প্রয়োজন হত বা আবার কখনও কখনও ওদের সংখ্যা কমাবারও প্রয়োজন হত। তার কারণ হচ্ছে মাইনে দিয়ে যে সমস্ত তরুণ চিকিৎসকদের নিযুক্ত করা হত, তারা যদি অন্য কোনও জায়গায় কোনও

বেশী টাকা পাওয়ার সুযোগ পাবে ব'লে মনে করত বা কারুর চাকরী বদলাবার অভিরুচি হত তাহ'লে তারা খুব কম দিনের নোটীশ দিয়ে বা নোটীশ না দিয়েই সরে পড়ত। বরাবরের জন্য যে সমস্ত ডাক্তার নিযুক্ত করা হয়েছিল তার সংখ্যা ছিল আট জন এবং তাঁরা সকলেই ভালভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ। এ ছাড়াও বেশ কয়েকজন সাময়িকভাবে নিযুক্ত ডাক্তারও ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার হাসপাতালে যে সমস্ত চিকিৎসক কাজ করতেন তাঁরা সকলেই ছিলেন যথেষ্ট পারদর্শী এবং সাধুপ্রকৃতির। এখন এই প্রতিষ্ঠানটি ক্লিনিক আখ্যা পাওয়ার যোগ্য।

ক্লিনিকের বাড়ী তৈরীর পরিকল্পনাটিই ছিল অন্য হাসপাতালের থেকে স্বতন্ত্র, এবং অন্যান্য ক্লিনিক যেভাবে পরিচালিত হয় তার থেকে স্বতন্ত্র ধরনে এই ক্লিনিকটি পরিচালনা করা হত। সাধারণতঃ কি ধরনে ঐ ক্লিনিকটি পরিচালনা করা হত তা বলছি : একজনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তা পরিচালিত হত। সেই একজন অন্য কেউ নয়, আমিই সেই একজন। সেইজন্য কোনও মত-বিরোধের সম্ভাবনা থাকত না। যে সমস্ত রোগী এত দুর্ব্বল যে তারা হাঁটতে অক্ষম এবং যাদের ক্লিনিকের গয়ংগচ্ছ ধরনে পরীক্ষা ক'রে দেখবার সময় পাওয়া যেত না তাদের সোজা হাসপাতালে ভর্ত্তি করে দেওয়া হত এবং হাসপাতালের সাধারণ পুরণো রীতি অনুযায়ী তাদের পরীক্ষা ক'রে দেখা হত। যারা অত দুর্ব্বল হয়ে পড়েনি এবং যাদের পরে হাসপাতালে পাঠানও প্রয়োজন এমন ধরনের রোগীদের প্রথমে ক্লিনিকে পরীক্ষা ক'রে দেখা হত এবং পরে আরও ভাল ভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্য তাদের হাসপাতালে পাঠান হত এবং সেখানেই তাদের চিকিৎসা হত। যাদের হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করার প্রয়োজন হত না, তাদের বলা হত 'অস্থায়ী' রোগী। তাদের পরীক্ষা ক'রে দেখা হত, ঔষধ দেওয়া হত বা চিকিৎসা করা হত এবং তারপর তাদের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হত। প্রয়োজনানুসারে হয়

তাদের পরীক্ষার জন্য আবার আসতে বলা হ'ত, নয়ত সে কেমন থাকে চিঠির মারফৎ তা জানিয়ে দিতে ব'লে দেওয়া হত। এই ধরনটি হচ্ছে যখন এক একজন চিকিৎসক নিজের চেম্বারে বসে কাজ করেন ঐ রকম, কিন্তু তফাৎ হচ্ছে ঐখানে সর্ব্ববিষয়েরই বিশেষজ্ঞদের পাওয়া যায়।

হাসপাতাল গ'ড়ে তোলার প্রচেষ্টার মধ্যে একটি বিষয়েই আমি খুব আনন্দই পাই তা হচ্ছে নার্সদের ব্যাপার। আমি যখন মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রছিলাম তখন দেখেছিলাম নার্সদের প্রতি কিরকম অসদ্ব্যবহার করা হত—এবং তখন থেকেই আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে যদি কখনও কোনও নার্স আমার অধীনে থেকে কাজ করে, তাকে আমি সব ঝঞ্ঝাট থেকে রক্ষা করব। নার্সিং শিক্ষা দেবার স্কুল প্রতিষ্ঠা করবার পর আমি যখনই ঐ শিক্ষাকেন্দ্রে নতুন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করলাম আমি তাঁকে স্পষ্ট ক'রেই ব'লে দিয়েছিলাম যে, যে সমস্ত ছাত্রী-নার্স ঐ স্কুলে শিক্ষা নেবে তাদের সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক এমন ব্যবহার করবেন যেন ওরা আমার নিজের মেয়ে। কোন কারণেই তারা যখন 'ডিউটি'তে থাকবে তখন বা অন্য কারও সামনে তাদের যেন তিরস্কার করা না হয়। যদি সত্যই তার কোনও ত্রুটী সংশোধন করা প্রয়োজন মনে করেন তাহ'লে তিনি যেন তাকে নিজের অফিসে নিয়ে গিয়ে তা করেন। যখন কোনও রোগী হৃষ্টচিত্তে বলত আমার নার্সরা কত শিষ্ট এবং প্রফুল্ল তখন মনে হত আমি যেন সঙ্গীত শুনছি—এর চাইতে মধুরতর সঙ্গীত জীবনে আর আমি শুনি নি এবং এই ধরনের প্রশংসা আমি বহুবার শুনেছি। আমি সব সময়েই নার্সদের আমোদ-আহ্লাদ করার সুযোগ দেবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, এবং দুঃখের সঙ্গে স্মরণ করছি যে চেষ্টা আমি করেছিলাম তা কতই নগণ্য! তারা যে খাবার খেত আমিও ঐ একই ধরনের খাবার খেতাম। তাদের বাসস্থান ছিল আমারই বাসস্থানের মত। আমার কয়েকজন পুরণো নার্স আজকাল

ঠাকুমার পর্য্যায়ে পড়েছে কিন্তু আমার কাছে তারা আগের দিনের মতই আদরের মেয়ে। আজও তারা খুবই বিশ্বস্ত। আমার দুঃখের দিনে তারাই বরাবর আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়ে এসেছে।

আমার বরাবরই ভাল লাগত যখন দেখতাম একটু ভীত প্রকৃতির একদল মেয়ে হাসপাতালে ঢুকছে এবং তিন বছর ধরে শিক্ষা শেষ ক'রে যাবার সময় কি সুন্দর আত্মনির্ভরশীল তরুণীতে রূপান্তরিত হয়েছে!

সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর যাবৎ হাসপাতাল পরিচালনা করে বুঝেছি যে হাসপাতাল পরিচালনার জন্য উপযুক্ত সহকারী পাওয়া প্রায় অসম্ভব এবং তা ছাড়া আয়কর বিভাগের লোকদের কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারি নি যে পৃথিবীতে এমন বোকা লোকও আছে যে কোনও টাকার প্রত্যাশা না রেখেই পরিশ্রম করতে পারে এই দু'টো কারণের জন্য আমি স্থির করলাম যে আমি এই বোঝার ভার থেকে নিজেকে রেহাই দেব। তাই আমি করলাম—খুবই আনন্দসহকারে এটা আমি সেণ্ট জোসেফের সিস্টারদের কাছে মাত্র এক ডলার মূল্যের বিনিময়ে বিক্রী করে দিলাম: ঠিক এক ডলার মূল্যই আমি নিলাম। শুনছি ঐ এক ডলার থেকে এখন অবশিষ্ট আছে উনসত্তর সেণ্ট মাত্র, কিন্তু এখনও তা আছে।

হাসপাতালটি সিস্টারদের কাছে হস্তান্তরিত করে দিলাম—কোন-ও ঋণে তা আবদ্ধ ছিল না, কোলাবিন ভর্ত্তিই ছিল, সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষে ভাঁড়ার ভর্ত্তি, এবং সব কিছুই চালু অবস্থায় ছিল। আমি এ কথা বলবার সময় গর্ব্ব অনুভব করছি। অভাবে পড়ে একে একে আমাকে বিক্রয় করতে হয়নি। অনবরত দোহন করতে থাকলে গরু যেমন ক্লান্ত হয়ে পড়ে—আমিও ঠিক ঐ ধরনের ক্লান্তি অনুভব করছিলাম। আমার এই কাজটি খুবই বিবেচকের মত হয়েছিল এই থেকেই প্রমাণ হবে, যে কেউই জীবনে কখনও না কখনও বুদ্ধিমানের মত কাজ করবেন। সিস্টারেরা খুব সুষ্ঠুভাবেই সেবা করছে এবং আজও

করছে—এ কথা ঠিক, টাকার বিনিময়ে এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সেবা পাওয়া যেত না। তাদের এই ধরনের সেবা আমার বহুদিনের বিস্মৃত বিশ্বাসকে আবার যেন জাগিয়ে তুলছে। আমার রোগীরা টাকা দিয়ে আমার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি সিস্টারদের সেবার গুণে ঐ প্রতিষ্ঠান যেন রোগীদের বছরের পর বছর সাহায্য করতে পারে। রোগীরা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য টাকা দিয়েছে কিন্তু আমাকে দশ সেণ্টও কেউ দেয় নি। আজ প্রতিষ্ঠানটি গ'ড়ে উঠল—প্রথমে ছিল বিরাট একটি কল্পনা, স্বাভাবিকভাবে এবং দুঃখময় অনমনীয় গতিতে আজ তা' বাস্তব রূপ পেয়েছে।

সুখের বিষয়, বেসরকারী হাসপাতাল আজকাল আর নেই। ওরা ওদের কাজ শেষ ক'রে দিয়েই নির্লিপ্ত হয়ে গেছে। আজকের দিনে সকলেই চায় হাসপাতালে থেকে চিকিৎসা করাতে। তারা হাসপাতালের মূল্য বুঝতে শিখেছে এবং তাদের প্রতিষ্ঠার জন্য এবং বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তারা অর্থ সাহায্য করতে আগ্রহান্বিত। তারা রোগাক্রান্ত হ'লে ভাল হয়ে ফিরবেই -এই আশা নিয়ে নির্ভরতার সঙ্গে তারা আজকাল হাসপাতালে যায়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

চিকিৎসকদের দৃষ্টিভঙ্গীতে যে সমস্ত জীবনের শোকাত্মক চিত্র ধরা পড়ে সেগুলো বিশদভাবে লিখে রাখা যায় না, কেননা বলার মত সুন্দর জিনিষ ওগুলো নয়। কিন্তু ঐ সম্বন্ধে আগে যতটুকু বলা হয়েছে তার চাইতে অনেক কিছুই বেশী বলা যায়। এমন দিন শীঘ্রই আসবে

যখন সত্যকে সহজভাবে উদ্ঘাটিত করা যাবে কিন্তু আজও সে সময় আসে নি। কিন্তু অনেক রোগীর সংস্পর্শে এসে আমি অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছি যে অভিজ্ঞতা লাভ করা খুব অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘ'টে থাকে এবং সেইজন্যই আমি ঐ বিষয়ের ভূমিকাটি লেখার সাহস রাখি।

যদিও মানুষের হৃদয়াবেগ ঘটিত অবস্থাটি হচ্ছে মানুষের মনের নানান ভাবধারার সংমিশ্রণের ফল, মূল অবস্থাটির বিশ্লেষণ করা অসম্ভব নয়। এগুলো হচ্ছে ভয়, ঘৃণা এবং দুঃখ। প্রকৃতির মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পর্য্যায়-ক্রমেই ওদের বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। সেইজন্য ডাক্তারদের কাছে রোগীরা যখন তাদের অসুখের কথা বর্ণনা করেন, তখন চিকিৎসকেরা অনুমান ক'রে থাকেন হয়ত রোগীর একটি বা তার চাইতে বেশী পূর্ব্বোক্ত মূল আবেগ তার মনের মধ্যে আলোড়ন তুলছে।

রোগীর মনে যদি কোনও রোগের ভয় থাকে, তাহলে সম্ভবতঃ সে ঐ রোগে আক্রান্ত হয় নি, চিকিৎসক এই ধারণা নিয়েই কাজ সুরু করতে পারেন। এটি একটি আশ্চর্য্য ঘটনা, কিন্তু প্রায়ই এর সত্যতা প্রমাণিত হয়—শরীরের কোনও রোগের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ নয়। যে লোক এসে ক্যানসারের প্রচলিত ভাষায় জোর গলায় বলে ওঠেন "ডাক্তারবাবু, আমার পেটের মধ্যে ক্যানসার হয়েছে"—অর্থাৎ কি না "ডাক্তার গ্যাসট্রিক কারসিনোমার জন্য আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি।"—তাদের বেলায় আমি দেখেছি এক বারও তারা সত্যি অত কষ্ট পান নি। ব্যাপারটি অদ্ভুত শোনালেও খুবই সত্য। যে রোগী প্রকৃতপক্ষে যক্ষাক্রান্ত হয়েছে, সাধারণতঃ সে এ সম্পর্কে বিস্ময়কর রূপে উদাসীন থাকে। সে সব সময়েই এই আশাই পোষণ করে যে রোগ থেকে মুক্তি পাবে। যারা যক্ষারোগে আক্রান্ত হয়েছে ব'লে মনে ভয় নিয়ে আসে, আসলে তারা কখনই ঐ রোগে আক্রান্ত হয় নি।

মানুষের মধ্যে রাগ বা ভয়ের প্রকাশ খুব সহজেই বোঝা যায়—

এগুলো খুবই পরিস্ফুট। দু'টোর মধ্যে প্রভেদ হচ্ছে কেবল মাত্রার তারতম্য। অন্য দিকে দুঃখ এমন একটি আবেগ যা কেবলমাত্র শুনে নির্ণয় করতে পারা যায় না। মানুষের বোধশক্তি দিয়ে তা' কেবল অনুভব করা যায়। দুঃখ অপরিস্ফুট। যে নিজে দুঃখ ভোগ করে নি সে কখনও তা' অনুভব করতে পারবে না। এ কথা খুবই সত্য, গভীরতম দুঃখের সময় মানুষ কাঁদতেও ভুলে যায় এবং কোনও অভিযোগ করতেও ভুলে যায়।

দুঃখ হচ্ছে আপেক্ষিক এবং বিভিন্ন বয়সে ওর সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি জাগে। পরিণত বয়সে যখন পরিবারের ছেলেমেয়েরা প্রাপ্ত-বয়স্ক হয় এবং নিজের নিজের ঘরসংসার পাতে এবং যখন স্বামী-স্ত্রী আবার কেবল পরস্পরের প্রতি নির্ভর ক'রে বেঁচে থাকে তখন যদি তাদের একজনের মৃত্যু হয় তাহ'লে যে বেঁচে থাকে সে গভীরতর দুঃখ পায়। যখন তাদের ছেলেমেয়েরা ক্রমে ক্রমে বড় হতে থাকে তখন স্বামী স্ত্রী পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ছাড়াও তাদের ছেলেমেয়েদের প্রতিও উভয়েরই আকর্ষণ থাকে। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে নিজের নিজের সংসার নিয়ে যখন ব্যস্ত থাকে এবং বাপ-মায়ের কাছ থেকে দূরে সরে যায় তখন স্বামী-স্ত্রী আবার পরস্পর পরস্পরকে ফিরে পায়। বৃদ্ধ হয়ত কোনও রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তার সঙ্গিনীও মারা পড়ে। এই সব ক্ষেত্রে এমন একটি জিনিষের সন্ধান পাওয়া যাবে যা শরীরতত্ত্ব-শাস্ত্রের মধ্যে পাওয়া যাবে না।

চিকিৎসকের সমস্যা জটিলতর হয়ে উঠে যখন শরীরের রোগের সঙ্গে সঙ্গে মনের রোগও দেখা দেয়। যেমন সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কাছে যেতে ইচ্ছে হয় এবং মরতে ইচ্ছে হয়—এই সব ক্ষেত্রে রোগ থেকে সেরে ওঠা শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আমি এত দেখেছি যে যখন দেখি কোনও বৃদ্ধ একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার তার শরীরের উপর করতে বাধা

দেয় তখন আমি আর তাকে পীড়াপীড়ি করি না। ঐ সুন্দর রীতিটি লঙ্ঘন করতে কেউই সাহস করে না।

দুঃখ যখন রোগীর কষ্টের মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় তা সব চাইতে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় রোগীর নিদ্রাহীনতা দেখে। যখনই শরীরের কোনও কষ্ট না থাকা সত্ত্বেও রোগী নিদ্রাহীনতার অভিযোগ করে তখনই দুঃখের আবেগের জন্য এই সম্ভাবনা হতে পারে কিনা তা ভেবে দেখা উচিত। এই সব ক্ষেত্রে আসল অবস্থাটি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা ক'রে চিকিৎসক একটি নিঃস্বার্থ উপকার করতে পারে। মানুষ যত রকম রোগ সম্বন্ধে অভিযোগ ক'রে থাকে তাদের মধ্যে সব চাইতে বেশী আমার সহানুভূতি উদ্রেক করতে সমর্থ হয় রোগীর নিদ্রাহীনতার কষ্ট। নিদ্রাহীন রোগীর কাছে রাতটি মনে হয় যেন চিরস্থায়ী। যে চিকিৎসক তাঁর রোগীর এই যন্ত্রণাটির উপশম করতে পারেন তিনি মানুষের যন্ত্রণা উপশম করার জন্য যথেষ্ট করেছেন বলে বিবেচিত হবে।

উদাহরণ হিসাবে আমি একটি ঘটনার উল্লেখ করব। একটি ছেলের বড় ভদ্রপ্রকৃতির মা আগে আমার রোগী ছিলেন। তিনি যখন জানতে পারলেন যে মহাযুদ্ধ বন্ধ করার জন্য যে যুদ্ধ সুরু হয়েছে তাতে যোগ দেবার জন্য তাঁর ছেলে যাত্রা করছে তখন থেকেই তিনি রাত্রে আর ঘুমোতে পারতেন না। যথাসময়ে ফ্রান্সে তাঁর ছেলেকে কবর দেওয়া হল। তিনি কোনও দিনই এই দুর্ঘটনার কথা কখনই উল্লেখ করেন নি এবং তাঁর অনিদ্রারোগও অব্যাহত রইল। কয়েক বছর পরে আমি তাঁকে বলতে বাধ্য হলাম যে তিনি এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত। একটি বিচিত্র ধরনের আনন্দময় দৃষ্টি ফুটে উঠল তাঁর চোখ দু'টিতে। আমাদের দু'জনের কেউই কোনও কথা বলতে পারলাম না। আমার পূর্বোক্ত মত প্রকাশের জন্য কি ফল হবে তা আগেই অনুমান করেছিলাম, তা না হলে অত স্পষ্টভাবে কখনই আমার মত ব্যক্ত করতে পারতাম না।

আগের ঘটনা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে এই ধরনের রোগীর চিকিৎসা করার সময়ে ভুললে চলবে না যে তিনি একজন ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে ব্যবহার করছেন। অর্থাৎ কি না একটি ডাক্তার এবং তাঁর রোগীটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অনেক ডাক্তার এবং অনেক রোগীর থেকে। প্রথম ক্ষেত্রে ডাক্তার কোনও বিজ্ঞানসম্মত নির্দ্দেশানুযায়ী চিকিৎসা করেন না, কিন্তু শেষোক্ত ক্ষেত্রে সাধারণতঃ প্রচলিত কয়েকটি রীতি অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। প্রথম ক্ষেত্রে ডাক্তার এবং রোগীর সম্বন্ধ দ্বিতীয় ক্ষেত্রের ডাক্তার এবং রোগীর সম্বন্ধের চাইতে ঘনিষ্টতর এবং অন্তরঙ্গ। যদিও ডাক্তার এবং তাঁর রোগীর সম্পর্কের মধ্যে এমন অনেক জিনিষই থাকে যা সহজে বোঝা যায় না এবং এমন অনেক আবেষ্টনীর সৃষ্টি হতে পারে যা ডাক্তাররা সমাধান করতে পারেন এবং তাঁর এই ধরনের কার্য্য-কলাপ রোগীকে সাহায্যই করবে।

আমি এই সমস্ত সূক্ষ্ম সমস্যাগুলি আলোচনা করব কয়েকটি আসল ঘটনার উদাহরণ দিয়ে। এই সব ক্ষেত্রে মিলন এবং বিরহের সংমিশ্রণ দেখা যাবে। অলস মহিলারা প্রায়ই নানান রকম অসুখে ভোগেন। সাধারণতঃ তাঁরা যে সমস্ত ক্লাবের সদস্যা সেই সমস্ত ক্লাবেরই উপযুক্ত বিশেষ বিশেষ রোগে ভোগেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় সাহিত্য চর্চ্চার ক্লাবের সদস্যারা সাধারণতঃ ভুগে থাকেন মাথার যন্ত্রণায়। ব্রিজ ক্লাবের সদস্যারা ভুগে থাকেন অজীর্ণ রোগে। এই ধরনের রোগীরা কেউ তাঁর রোগ ধরেছে জানলে প্রীত হন, কিন্তু কেউ তাঁদের প্রতি সহানুভূতি জানালে প্রীত হন না, কেননা নিজেদের বাড়ীতে তো তাঁরা যথেষ্ট সহানুভূতি পেয়ে থাকেন। যে সমস্ত ডাক্তারের গোয়েন্দাসুলভ মনোবৃত্তি থাকে কখনও কখনও তাঁদের ঐ শক্তি কাজে লাগান দরকার হয়। আসল ঘটনা রোগীকে উপলব্ধি করাতে পারলে বুঝতে হবে যে নব-জীবনের প্রথম সোপানে উঠতে তাঁকে সাহায্য করা হয়েছে এবং তারপর

সহজেই তিনি রোগ থেকে সেরে উঠতে পারবেন। প্রথমে হয়ত রোগী ডাক্তারবাবুকে বন্ধু বলে মনে করবে না কিন্তু যদি তিনি জীবনকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার জন্য রোগীকে অনুপ্রাণিত করে থাকেন তাহ'লে পরিবারের অন্যান্য পরিজনেরা ডাক্তারবাবুর এই প্রচেষ্টার জন্য প্রশংসাই করবেন।

এই ধরনের একটি ঘটনার কথা বলছি: পঁয়তাল্লিশ বছরের নিঃসন্তানা একটি মহিলা বইয়ে যত রকম কষ্টের কথা লেখা আছে সব রকম কষ্টের অভিযোগই তিনি করতেন। কিন্তু আসলে কেবলমাত্র পাকস্থলীতেই যন্ত্রণা হত। তিনি ছিলেন কয়েকটি ক্লাবের দলকর্ত্রী—তাঁর নিজের ধারণা ছিল যে তিনি বুদ্ধিমতী কিন্তু আসলে তাঁর বুদ্ধি খুব বেশী ছিল না। আমি তাঁকে বিশদভাবে বুঝিয়ে বললাম যে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বহুক্ষেত্রেই একটি রোগ নয় ওটা একটি অবস্থা এবং সকলেই নিজের নিজের শরীর ঠিক রেখে কিভাবে বেঁচে থাকবেন তা' শেখা প্রয়োজন; দুর্ব্বল লোকেরা ঐটুকু উপকার করে গেছেন। তিনি অনবরত বলতেন: "কেন আমি অন্যান্য স্ত্রীলোকদের মত সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ করব না তার তো কোনও কারণ দেখছি না।" তার উত্তরে আমি বললাম, "ভদ্রে, আজ পর্য্যন্ত এমন কোনও পন্থা আবিষ্কৃত হয় নি যার দ্বারা টি-মডেলের গাড়ীর উপর রঙ চড়িয়ে তাকে প্যাকার্ড-এ পরিণত করতে পারা যায়।" আমার উত্তরের এই রূঢ় সত্য তাঁকে এতদূর বিচলিত করলে যে, তিনি যেন এক নতুন মানুষে রূপান্তরিত হলেন! অবশ্য তিনি আমার উপর খুবই চ'টে গেলেন এবং আজ পর্য্যন্ত তাঁর সে মনোভাব বদলায় নি। কিন্তু তাঁর স্বামী হচ্ছেন আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

এই ধরনের রোগীরা দলবদ্ধ চিকিৎসার উপযোগী নয় এবং তাঁদের মধ্যে এমন জিনিষও পাওয়া যায় না যা নিয়ে ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করা যায়। তাছাড়া দলবদ্ধ ধরনে এই সমস্ত রোগীর চিকিৎসা করলে ঐ

সংক্রান্ত সূক্ষ্ম বিষয়গুলি আবিষ্কার করা যায় না। এটা খুবই স্বাভাবিক যে রোগী হাসপাতালের অনেক ডাক্তারেরই সংস্পর্শে আসবে যাঁরা রোগীর মধ্যে রোগ খুঁজে বা'র করবার চেষ্টা করবেন এবং তাহ'লেই রোগী যে সমস্ত কষ্টের ব্যাপার সম্বন্ধে অভিযোগ করছেন সেগুলোর সঙ্গে লক্ষণ মিলিয়ে দেখলে আসল রোগটি ধরা পড়বে। আজ ভাবলে খুবই দুঃখ পাই যে কেবলমাত্র আমি অনেকক্ষণ ধরে রোগীকে পরীক্ষা ক'রে দেখবার সময় পাই নি ব'লে তাদের রোগের যথার্থ কারণ ধরতে পারি নি এবং ভুল কারণ নির্ণয় করেছি।

কখনও কখনও অবশ্য রোগীর সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়ে উঠত না। আমার মনে পড়ছে একবার একজন লোক এসে আমাকে বললে তার পেটের ভিতরে ক্যানসার পরীক্ষা করে দেখবার জন্য। লোকে তাকে বলেছিল যে, সে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছে। তার দৃষ্টি ছিল উদভ্রান্ত—ঐ ধরনের সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হলে চোখের রং যে বিশেষ ধরণের হয় সে রকম নয়। আমি তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলাম। সে হাসপাতালে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল এবং তার রোগের অবস্থা সম্বন্ধে জানবার জন্য আমি যখন প্রশ্ন করছিলাম সে বিরক্তির সঙ্গেই তার উত্তর দিচ্ছিল। আমি যদি তার পাকস্থলীর ক্যানসার সারাবার ভার না নিতাম তাহ'লে আর কেউ নিশ্চয় সে ভার নিত। তার পরের দিন তার একটি ছেলে সহরে এল, অস্ত্রোপচারের সময় বাবার কাছে থাকবে ব'লে। তার বাবার রোগ সম্বন্ধে জানবার জন্য ছেলেটিকে অনেক প্রশ্ন করলাম এবং তাকে বললাম যে তার বাবার ক্যানসার হয়নি। তার কাছ থেকে আমি জানলাম যে মাস তিনেক আগে তার মায়ের মৃত্যু হয়েছে—এবং তারপর থেকে তার বাবা প্রায় কিছু খেতেন না বললেই হয়। আমরা দু'জনে তার বাবাকে যে ঘরে রাখা হয়েছিল সেখানে গেলাম এবং তাকে বুঝিয়ে বললাম যে অস্ত্রোপচারের

দরকার হবে না॥ আমি ঐ ভদ্রলোকের ছেলেকে বললাম তার বাবাকে হার্ভে হাউসে নিয়ে যেতে এবং সব চাইতে ভাল খাবার কিনে খাওয়াতে। এই কথা বলে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বাপ এবং ছেলের মধ্যে ঠিক কি ঘটল তা আমি জানি না কিন্তু পরের দিন তারা দু'জনে এক সঙ্গে আমার অফিসে এল। বাপের মুখখানা দেখে আমার মনে পড়ল এ যেন ব্যঙ্গচিত্রের যে বাঘ তার বাঘিনীকে খেয়ে ফেলেছে তারই মুখ। আমি আর তাকে জিজ্ঞাসা করি নি সে খাবার খেয়েছে কি না। ওর আর প্রয়োজন ছিল না। ঐ ভদ্রলোকের ছেলেটি যে তার বাবার সম্বন্ধে সমস্ত সত্য ঘটনা আমাকে জানিয়েছে, একথা সে তার বাবাকে বলেছে কিনা আমি জানি না। দুঃখের সঙ্গে বলছি, যদিও তারপর তিন বছর যাবৎ তাকে খুব সবল সুস্থ ব'লেই মনে হয়েছিল এবং আগের মত চল্লিশ পাউণ্ড ওজনেও বেড়েছিল, শেষ পর্য্যন্ত সে একটি পাগলদের হাসপাতালে মারা পড়ে।

এই ধরনের সমস্ত কেসগুলিই যে এ রকম বিয়োগান্তক হয় তা' নয়। আসলে কতকগুলো খুবই মজার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। রোগী ঠিক যা যা বলেছিল তা হুবহু উদ্ধৃত করা দরকার, নইলে গল্পের আসল কৌতুক রসটুকু ঠিক উপভোগ করা যাবে না। একজন বুড়ো গোছের রেলের ইঞ্জিনীয়ার নিজের নাম রেজিষ্ট্রী না ক'রেই হুড়মুড় ক'রে আমার ঘরে ঢুকে পড়লেন। বললেন, "দেখুন ডাক্তারবাবু আমি বড় সহরে গিয়েছিলাম।" আমি বললাম, "তাই নাকি?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, রাস্তার শেষে যে ডাক্তার আছে তাঁকে দেখিয়েছিলাম। তিনি বললেন আমার ক্যানসার হয়েছে এবং আমাকে চীফ সার্জেনের কাছে পাঠালেন। আপনার মনে আছে ২১শে মার্চ্চ কি ভীষণ ঝড় হয়েছিল?" আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম। "দেখুন, আমি গোল্ডেন ষ্টেটকে চালাচ্ছিলাম এবং এমন ধূলোর ঝড় উঠেছিল যে

আমি ডিপোর নামও পড়তে পারি নি এবং পোষ্টের উপর নম্বরগুলিও দেখতে পাই নি। আমি কেবল মাঝে মাঝে ঐ ধুলোর ঝড়ের মধ্যে দিয়ে সত্তর মাইল বেগে আমার ইঞ্জিন চালিয়ে নিয়ে গেলাম। যখন আমি আমার নির্দ্দিষ্ট প্রান্তে এসে পড়লাম তখন আমার দফা প্রায় শেষ হবার উপক্রম—আমার ফায়ারম্যান আমাকে ধরাধরি করে ইঞ্জিন থেকে নামাল। আমি কিছুই খেতে পারলাম না। কেননা আমার পেটটি বেশ ফুলে উঠেছিল এবং আমার গলা পর্য্যন্ত কি যেন ঠেলে উঠল। এর ফলে দশ দিনেই আমার ওজন পনের পাউণ্ড কমে গেল। স্থানীয় সার্জেন বললেন, 'ছেষট্টি বছর বয়সে পনের পাউণ্ড ওজন কমে যাওয়ার অর্থ ক্যানসার।' তারপর আমাকে চীফ সার্জেনের কাছে পাঠালেন। তিনি আমাকে হাসপাতালে পাঠালেন—ওখানে একদল লোক আমাকে টেনে দাঁড় করালে অন্ধকারে—আমার সার্ট খুলে দিলে এবং আমার চব্বিশটা ফোটো নিলে। এক সপ্তাহ পরে ডাক্তাররা পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ সুরু করলেন। মোট আট জন ডাক্তার ঐ পরামর্শ বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা তিনটি দলে বিভক্ত হলেন। একদল বললেন আমার ক্যানসার হয়েছে, আর এক দল বললেন, না আমার ক্যানসার হয় নি এবং তৃতীয় দল বললেন, অস্ত্রোপচার ক'রে দেখা যাক কা'র কথা ঠিক। আমার স্ত্রীকে আমি বললাম, 'আমরা বাড়ী যাচ্ছি' আসলে আমরা আপনার কাছেই এলাম।" সে আরও বললে: আমি গোড়া থেকেই আমার কি হয়েছে জানতাম—শুধু ঐ ধুলোর ঝড়ের জন্যই আমার এই অবস্থা হয়েছিল কিন্তু আমি কিছুতেই ডাক্তারদের সে কথা বোঝাতে পারি নি—ওঁরা আমার কথা শোনেনই নি।" সে প্রাণ খুলে হেসেছিল এবং সপ্তাহ তিনেক পরে আবার তার কাজে যোগ দিয়েছিল।

কয়েকটি রোগীর ব্যাপারে ডাক্তারের কাছে রোগীর যে ইতিহাস

বর্ণনা করা হয়ে থাকে তাতে ভুল ক'রে অর্গ্যানিক রোগের বিষয়টি বলা হয়ে থাকে। ঐ সমস্ত লক্ষণের আসল কারণ খুঁজে দেখলে দেখা যাবে ওর জীবনে অতীতকালে নিশ্চয়ই একটি দুঃখের ঘটনা ঘটেছিল, যার প্রভাবের কথা রোগী কল্পনাও করতে পারে নি বা ডাক্তারকেও বলতে পারে নি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়ত কোন ছোট্ট শিশুর মৃত্যু ঘটেছে : বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যে-সব শিশু আর কোনও দিনই ফিরে আসবে না তাদের বিয়োগ-ব্যথাই নানান ঝঞ্ঝাটের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে কি ভাবে সমস্যার সমাধান করা যাবে সে কথা পাঠ্যপুস্তকে লেখা নেই। পাঠ্যপুস্তকে বরং এইই লেখা আছে যে ঐ ধরনের সমস্যার কোনও সমাধানই হয় না। এই ধরনের উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে সার্জেনরা কত অসুবিধা ভোগ করেন যখন তাঁদের বাধ্য হয়ে ক্ষতের উপর অস্ত্রোপচার করতে হয় যদিও তাঁরা বেশ ভাল ক'রেই জানেন ওর সঙ্গে রোগীর রোগের আসল কারণের কোনও সম্বন্ধই নেই।

গ্রামাঞ্চলের চিকিৎসকেরা বৃদ্ধ লোকেদের চিকিৎসা খুব সুন্দর ভাবেই ক'রে থাকেন। তাদের আরাম নিতে পারলেই হল। যদি তাদের কোনও মন্দ অভ্যাস থাকে তাতে বাধা দিতে নেই। সম্প্রতি খবরের কাগজে এক ছোট ব্যঙ্গকাব্য বেরিয়েছে। তাতে দেখান হয়েছে কোন্ কোন্ কারণের জন্য মানুষ দীর্ঘজীবি হতে পারে। যমজদের কোনও আশা নেই। কেউ কেউ বলে থাকেন তাঁরা এতদিন বেঁচে আছেন শুধু এই জন্যই যে তাঁরা ছোট বয়স থেকেই তামাক খাওয়ার অভ্যাস করেছেন। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন জীবনে তাঁরা কখনও এই নোংরা অভ্যাসের দাসত্ব করেন নি ব'লেই এত দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে পেরেছেন।

অল্প কিছুকাল আগে আমার একজন অত্যন্ত ভদ্রপ্রকৃতির বন্ধু

আমার কাছে এলেন, কেননা তিনি রাত্রে ঘুমোতে পারতেন না। তাঁকে হাসপাতালে পাঠান হয়েছিল। চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা ক'রে তাঁর শরীরের মধ্যে নানান রোগ দেখতে পান এবং সেগুলোকে সারাতে চেষ্টা করেন—কিন্তু আসল ব্যাপার তাঁর রোগীর যে ঘুমের প্রয়োজন সব চাইতে বেশী সেদিকে মনোযোগ দেন নি। আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি হাসপাতাল থেকে চলে গেলেন, যেহেতু তাঁর কেমন ক'রে ঘুম হবে সে বিষয়ে আমি মনোযোগ দিই নি। এইভাবে চল্লিশ বছরেরও বেশী দিনের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে গেল। এ জন্ম আমার খুবই দুঃখ হয়, কিন্তু এর জন্ম আমিই সম্পূর্ণ দায়ী। তিনি আমার কাছে এসেছিলেন এক পুরণো বন্ধু হিসেবেই আমার পরামর্শ নেবেন ব'লে। আমি তাঁকে বৈজ্ঞানিক জটিলতার মধ্যে ফেলে দিলাম। একমাত্র এই কৈফিয়ৎই আমি দিতে পারি যে, আমি আমার অন্যান্য রোগীদের আরোগ্যসাধ্য ব্যাধির চিকিৎসা নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম; কিন্তু এটা কোন কৈফিয়ৎই নয়।

এ ছাড়া আর একটি ক্ষেত্রও আছে যেখানে আমাদের সেবার প্রয়োজন আছে। আজকাল ডাক্তারেরা মুমূর্ষু রোগীর শয্যাপার্শ্বে থাকা যে বিশেষ প্রয়োজন সে বিষয়ে অবহেলা দেখান। রাত্রে যে সব নার্সের ডিউটি থাকে তারাই এই সমস্ত কাজ করে থাকে। হাসপাতালে অবশ্য রোগীদের আত্মীয়-স্বজনেরা 'দেখা করার সময়' ছাড়া হাসপাতালের ভিতরে থাকতে পারেন না। চ'লে যাবার ইচ্ছা না থাকলেও তাঁদের বাইরে চ'লে যেতে হয় এবং আবার সকাল বেলায় ফিরে আসেন তাঁদের রোগী তখনও পর্য্যন্ত বেঁচে আছে কি না দেখতে এবং ডাক্তারেরাও এক ঘণ্টা কি দু' ঘণ্টা পরে ওঁদেরই মত ফিরে আসেন।

কিন্তু পারিবারিক চিকিৎসকের বেলায় এবং বাড়ীতে গিয়ে রোগী দেখার সময় অন্য রকমের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। ঐ সব ক্ষেত্রে

পরিবারের পরিজনেরা রোগীর শয্যাপার্শ্বে জড় হন। ডাক্তারবাবু নিজে উপস্থিত থেকে লক্ষ্য রাখেন যেন রোগী জীবনের শেষ কয়েক ঘণ্টা কষ্ট না পায়। যদি এক কোয়ার্টার গ্রেণ মরফিনে কাজ না হয় তা'হলে পাঁচ বা ছ' গ্রেণে নিশ্চয়ই কাজ হবে। ওগুলো শিরার মধ্যে ইনজেকশান ক'রে দিতে হবে। আমি আমার রোগীদের জন্য সমস্ত জীবন ধ'রে যা করেছি তার বিনিময়ে পুরস্কার হিসাবে আমি এইটুকুই পেতে চাই, যেন আমার জীবনের শেষ কয়েক ঘণ্টা ঐভাবে আমার তদারক করা হয়।

ডাক্তারদের প্রায় আর একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়—তা হচ্ছে রোগীর রোগ যে আদৌ সারা সম্ভব নয় সে কথা তাকে বলা উচিত হবে কি না। আমার তরুণ জীবনে বহু পুরোহিতই বারবার আমাকে বলেছিলেন যে, অন্তত পক্ষে পাপীদের জানিয়ে দেওয়া উচিত যে তারা মারাত্মক রোগে আক্রান্ত, তাতে তারা ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে নিজেদের উপযোগী করার সময় পাবে। সাধারণ ডাক্তারেরা রাস্কিনের এই উক্তির সঙ্গে একমত হবেন ব'লে আমার বিশ্বাস: "পৃথিবীতে একটি জায়গাই আছে যেখানে মানুষ জ্ঞানতঃ চিন্তাহীন হয়ে থাকতে পারে—তা হচ্ছে তার মৃত্যুশয্যা। ঐখানে কোনও চিন্তাই আর করা উচিত নয়।"

যতক্ষণ পর্য্যন্ত সম্ভব রোগীদের এই পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা চিকিৎসকেরা সব সময়েই ক'রে থাকেন। এবং যদি তাঁর ঐ ধরনের কর্ত্তব্যকর্ম্ম পালনে বাধা পান তাহলে তিনি তার বিরুদ্ধে লড়েন। যে সমস্ত রোগ রোগীকে ভীত-সন্ত্রস্ত ক'রে তোলে, তাদের সম্পর্কেই একথা খাটে, বিশেষ ক'রে হৃদরোগের কথা বলা যায়। ভালভাবে চিকিৎসা করলে হৃদরোগাক্রান্ত রোগীও বহু বছর কর্ম্মঠ হয়ে বেঁচে থাকতে পারে। সেইজন্য কখনই তাদের জানান উচিত নয় যে তাদের অবস্থা সঙ্কটপূর্ণ, এবং প্রকৃত বিপদ যতখানি, তার চাইতে বাড়িয়ে বলা

তো কখনই উচিত নয়। আনাড়ীর মত তার আসল অবস্থার কথাও তাকে সচেতন ক'রে দেওয়ার ফলে খুবই অঘটন ঘটতে পারে। ডাক্তারের নিজের সুবিধার জন্য ঐ পরিবারকে বা পরিবারের কোনও একজনকে যথার্থ ব্যাপারটি জানিয়ে রাখা দরকার। কা'কে এই সত্য জানান হবে সে বিষয়ে যথেষ্ট হুঁসিয়ার হতে হবে যেন ঐ সংবাদটি সে রোগীর কানে পৌঁছে না দেয় হয়ত সে দুরভিসন্ধি বশতঃ ক্ষতি করার জন্য যে রোগীর কানে এই খবরটি তুলে দেবে তা নয়, হয়ত বক্‌বক্‌ করাই তার অভ্যাস এবং যা কিছু সে জানে তার সমস্তই এবং এ ছাড়া কিছু কল্পনার রঙ-ও তার উপর চড়িয়ে সব কিছু বলে দেওয়াই তার পক্ষে সম্ভব।

কোনও কোনও রোগী তাঁদের চিকিৎসকদের ব'লে থাকেন যে তাঁরা প্রকৃত কথা জানতে চান—এবং তাঁদের ধরন-ধারন দেখে অনুমান করা হয়ে থাকে হয়ত কঠোর সত্য শুনে ওঁরা ভেঙ্গে পড়বেন না। একবার এই ধরনের একটি রোগীর সংস্পর্শে আমি আসি। লোকটি খুবই বিশালকায়, সাউথওয়েষ্টে তিরিশ বছর যাবৎ সেরিফগিরি ক'রে খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর প্রথম কথাই হল: "আমি শুনেছি আপনি সত্য কথা বলেন। আমি জানতে চাই আমার ক্যানসার হয়েছে কি না এবং যদি হয়েই থাকে আপনি কিছু করতে পারবেন কি না।" আমি তাঁকে বললাম যে সত্যই তাঁর ক্যানসার হয়েছে এবং তা অস্ত্রোপচার করা যাবে না। পোষাক-পরিচ্ছদ প'রে নিয়ে তিনি বললেন, "আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার ফী কত?" উত্তরে আমি বললাম, "আমার কোনও ফী নেই।" "এভাবে ব্যবসা চলে না"—এই ব'লে তিনি টেবিলের উপর দশ ডলারের একটি নোট রেখে দিলেন, এবং মাথা উঁচু ক'রে খুবই গর্ব্বভরে ধীর পদবিক্ষেপে হলটি পার হয়ে গেলেন। তিনি বহুবার তাঁর কর্ম্মজীবনে ডাকাতদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন এবং মৃত্যুর সম্মুখীন

হয়েছেন—তিনি ক্যানসার রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করতে ভয় পান নি। তাঁর সেই চমৎকার ব্যক্তিত্বের ছবি আজও আমার মনে আছে। তিনি ছিলেন যথার্থ একজন পুরুষ।

ডাক্তার এবং রোগীর সঙ্গে যে ধরনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা আমি বর্ণনা করেছি সেই ধরনের সম্পর্ক ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হ'তে চলেছে। পারিবারিক চিকিৎসক হিসেবে যে সমস্ত চিকিৎসক সম্মান পেতেন ক্রমে হাসপাতাল গ'ড়ে ওঠবার পর থেকে ঐ ধরনের জিনিষ লুপ্ত হতে বসেছে। আজকাল হাসপাতাল এবং ক্লিনিকে বহু চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থেকে চিকিৎসা করানর রেওয়াজ হয়েছে। হাসপাতালে বা ক্লিনিকে বহু চিাকৎসকের চিকিৎসাধীন থেকে রোগ সারান কিছু আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার নয় কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে রোগীর সঙ্গে ডাক্তারের কোনও ঘনিষ্ট সম্পর্ক গ'ড়ে উঠার সুযোগ নেই। বহুকাল মেশামিশি হবার পর অমন প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠে। হঠাৎ যেমন ঘোষণা করলেই অন্তরঙ্গ ভাবে কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যায় না এ ক্ষেত্রেও তাই—বন্ধুত্বের সম্পর্ক গ'ড়ে উঠতে বহু সময় লাগে।

কয়েক ধরনের রোগ পারিবারিক চিকিৎসক ভালভাবেই চিকিৎসা করতে পারেন কেননা ঐ রোগী ঐ সমস্ত ডাক্তারদের বহুদিন ধ'রেই চেনে এবং তাঁদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধার ভাবও তার মনে থাকে। বিশেষ ক'রে যখন দুঃখ বা পরিবারের কোনও পরিজনের মৃত্যুর পর মনোকষ্ট থেকে কোনও রোগের সূত্রপাত হয়ে থাকে। এই সমস্ত রোগী তাদের পরিবারের ডাক্তারকে খুব গোপনীয় বিষয়গুলিও খুলে বলতে পারেন কিন্তু হাসপাতালের ডাক্তারের কাছে তাঁরা চুপ করেই থাকেন। চিকিৎসকের ব্যক্তিত্ব থাকা খুবই প্রয়োজন—তার প্রমাণ এই থেকেই পাওয়া যাবে যে একই ওষুধ যখন একটু আধটু বদলে দিয়ে খ্যাতনামা কোনও চিকিৎসক কোনও রোগীকে খাওয়ান তার অনেক বেশী ফল

হয়। অথচ সেই ওষুধই কোনও তরুণ ডাক্তার রোগীকে খাওয়ালে ঐ ধরনের ফল পাওয়া যায় না। শুনলে মনে হয় লোকগুলো কি বোকা, কিন্তু ঐটাই হচ্ছে মানুষের স্বভাব।

যখন বলি যে আজকাল কোনও কোনও বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপনের আর কোনও সুযোগই নেই, তখন আমার যে কত দুঃখ হয় তা ব'লে বোঝাতে পারব না। যখন কোনও রোগী বহু সহকারী পরিবেষ্টিত অবস্থায় থাকে তখন তো আর ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ মেলে না। এটি একটি নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবুও চিকিৎসকের বৃত্তিগত কর্ত্তব্যই হচ্ছে রোগের কষ্ট দূর করা। মৃত্যু যাতনাহীন—কিন্তু আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, আমাদের টেষ্ট টিউব এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্র থাকা সত্ত্বেও জীবন আমাদের কাছে দুঃখময়!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ঔষধবিজ্ঞান গত পঞ্চাশ বছরে কত দূর উৎকর্ষ লাভ করেছে তা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদগুলি পড়লেই বিচার করা যাবে। কিন্তু পরিসমাপ্তির আগে আজকের দিনে আমরা কি অবস্থায় ঠিক আছি তা স্পষ্ট করে বোঝাতে গেলে একটি শেষ পরিচ্ছেদের প্রয়োজন।

সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, জনসাধারণের পক্ষে দু'দিক দিয়ে এর উন্নতিলাভ হয়েছে: সাধারণভাবে বেশীর ভাগ লোকই লেখা-পড়া শিখে শিক্ষিত হচ্ছে—অর্থাৎ সকলেরই চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বিষয়-গুলিতে কিছু কিছু জ্ঞানলাভ হয়েছে: এবং সাধারণভাবে ঔষধ বিজ্ঞান এবং তার প্রয়োগের জ্ঞান উন্নততর হয়েছে।

চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞানের যে উৎকর্ষ হচ্ছে তা' বোঝা যাবে যখন আমরা লক্ষ্য করি মেডিক্যাল স্কুলে পড়তে হ'লে যে ধরনের প্রাথমিক লেখাপড়া জানা দরকার তার মান উন্নততর হয়েছে এবং মেডিক্যাল স্কুলে পড়ার মেয়াদও বৃদ্ধি হয়েছে এবং বহু বিদ্যালয়ে বাড়তি বেশ কয়েক বছরের জন্যও শিক্ষানবিশী করতে হয়।

আরও দীর্ঘসময় যাবৎ আজকাল চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ান হচ্ছে এই কারণে যাতে আমরা ছাত্রদের আরও ভাল ক'রে শিক্ষিত ক'রে তুলতে পারি। আসলে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে পাঠ প্রচলন করা হয়েছে তার মধ্যে এত কিছু জ্ঞানগর্ভ বিষয় শেখানর নির্দ্দেশ আছে যে, যে-কোনও ছাত্রের পক্ষেই ওর সব কিছু সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করা শক্ত। এর থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, যে-ধরনের উচ্চস্তরের পাঠ দেওয়া হয়, কেবল অসাধারণ বুদ্ধিমান ছাত্রদের পক্ষেই তা' থেকে বেশী জ্ঞানার্জ্জন করা সম্ভব—সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রদের পক্ষে তা' সম্ভব নয়। কিন্তু বিশ বছর আগে যে ধরনের শিক্ষা ছাত্ররা লাভ করত তার চাইতে এত বেশী জ্ঞানলাভ ক'রে আজকালকার অতি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্ররা যে তা' তখনকার সময়ের ছাত্রদের কল্পনারও অতীত।

চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান উন্নততর করার জন্য কেন এত চেষ্টা হচ্ছে? এর উত্তর দেওয়া এমন কিছু শক্ত নয়—এটা খুবই সোজা। ডাক্তারেরাও অন্য সমস্ত লোকের মত যন্ত্রণা, পরাজয় এবং ব্যর্থতার হাত থেকে বাঁচতে চায়। নিজের সম্বন্ধে কোনও কঠোর সমালোচনা কেউই পছন্দ করে না। ডাক্তারের কাছে তার রোগীর মৃত্যুর অর্থ কি? ওর অর্থ হচ্ছে এই তিনটি। অপরপক্ষে অগ্রগতির অর্থই বা কি? তার অর্থ কি রোগ দূর করা? অগ্রগতির অর্থ হচ্ছে, আমাদের সকলের শত্রু রোগ, দুঃখকষ্ট এবং মৃত্যুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার এক নতুন শক্তি লাভ করা।

মুহূর্তের জন্য ভেবে দেখা যাক কত দূর পথ আমরা অতিক্রম ক'রে এসেছি। আমি ১৮৮৬ সালের ক্যাটালগে পড়েছি মেডিক্যাল স্কুলে লেখাপড়া শিখতে হলে "দু'টো ধারাবাহিক বক্তৃতা শুনতে হবে —এক একটি শুনতে পাঁচ মাস লাগবে"। তার থেকে আজকাল অনেক বেশী পড়াশুনা করতে হয়, মেডিক্যাল স্কুলে এক একটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দেওয়া হয় ন' মাস ধ'রে এবং মোট সময় লাগে চার বছর। এ ছাড়াও এক বছর কোনও হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে কাজ শিখতে হয়। মেডিক্যাল স্কুলে লেখাপড়া শিখতে গেলে কমপক্ষে এই ধরনের পাঠ নিতেই হবে।

ছাত্রেরা যখন তাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের পাঠ নেওয়া শেষ ক'রে হাসপাতালে সংশ্লিষ্ট থেকে হাতে-নাতে কাজ ক'রে পটুতা লাভ করবার পর নিজে স্বাধীনভাবে রোগী দেখা সুরু করে, তখন সাধরণ লোকের মনে এই বিশ্বাসই জাগবে যে এই তরুণ একজন যথোচিত জ্ঞানসম্পন্ন চিকিৎসক। রোগের লক্ষণ দেখে রোগনির্ণয় করার ক্ষমতায় তারা এত বেশী যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে যে অর্দ্ধশতাব্দী আগেকার একজন সেরা চিকিৎসকেরও তা' কল্পনার অতীত। তারা বৈজ্ঞানিক ধরনে চিকিৎসা ভাল ক'রেই শিখেছে। যে বিজ্ঞান সে শিখেছে মানুষের অদ্ভুত খেয়ালের সঙ্গে তা'র যোগসূত্র রেখে যেন সে ঔষধবিজ্ঞান প্রয়োগ-কৌশল শিখতে পারে।

হসাপাতালে সংশ্লিষ্ট থেকে হাতে-কলমে কাজ শেখার পর অনেকেই তাদের নিজেদের স্বার্থের খাতিরে তখনই স্বাধীনভাবে রোগী দেখা সুরু না ক'রে কোনও একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক বা কোনও বিশেষজ্ঞের সহকারী রূপে কাজ করতে চায়। এই ধরনের কাজ শিখতে আরও দু' থেকে পাঁচ বছর পর্য্যন্ত সময় লেগে যায়। এক বছর স্কুলে পড়বার পর হাসপাতালে থেকে পড়াশুনা করতে হয়। হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত

চিকিৎসক প্রথমে রোগীর প্রাথমিক ইতিহাস জেনে নেন তারপর ঐ ছাত্রকেই রোগীর ভার নিতে হয় এবং তাদের প্রধানের শেষ পরীক্ষা করার সময় যা যা দরকার হবে সেগুলো সংগ্রহ ক'রে রাখা হচ্ছে ঐ ছাত্রের কাজ। এইভাবে ক্রমে ক্রমে রোগ নির্ণয় করার জ্ঞান সে লাভ করে।

এই ভাবে সংক্ষেপে আজকালকার তরুণ ডাক্তারের রূপান্তর পর্য্যবেক্ষণ করবার পরের কাজ হচ্ছে গত অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ চিকিৎসা বিজ্ঞানের অবদান সম্বন্ধে আলোচনা করা। এর উত্তরে হয়ত হাত নেড়ে কেউ কেউ বলবেন যে প্রথম পরিচ্ছেদে যে সমস্ত ভয়াবহ বিষয়-গুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো আজ সম্পূর্ণভাবে নির্লুপ্ত হয়ে গেছে এবং আজকাল যে সমস্ত কার্যকরী রোগপ্রতিকারক উপায় বেরিয়েছে সেগুলো গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত হয়েছে। এ কথা বললে অবশ্য সত্যের অপলাপ করা হবে না। যাই হোক, এখনও অনেক গোষ্ঠী আছে যেখানে ডিপথিরিয়া, বসন্ত এবং টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। যখন এই ধরনের সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হয় তখন বুঝতে হবে কেউ না কেউ তার কর্ত্তব্যে নিশ্চয়ই অবহেলা করেছে। কেবলমাত্র অষ্টপ্রহর তীক্ষ্ণ নজর রাখলে তাদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সরকারী হেল্থ্ সার্ভিস, স্টেট বোর্ড অফ হেল্থ্ এবং গ্রামাঞ্চলের হেল্থ্ অফিসার সব সময়েই জনসাধারণের অজ্ঞতার ফলে যে-সমস্ত রোগ বিস্তৃত লাভ করছে সেগুলো দূর করবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবিশেষের প্রচেষ্টা বন্ধ ক'রে দিলে শতাব্দীকাল আগের মতই রোগ ফিরে আসবে এবং সমস্ত ধ্বংস করে দেবে। জনসাধারণ সহজেই ভুলে যায় বীভৎস রোগের কবল থেকে তাদের বাঁচাবার জন্য আজকের দিনের চিকিৎসকদের অবিরাম সতর্ক দৃষ্টি এবং অতীত দিনের চিকিৎসক-

দেরও আপ্রাণ চেষ্টার কথা এবং এই জন্যই তারা যে নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সঙ্গে বেঁচে আছে সে কথাও ভুলে যায়।

রোগের বিস্তৃতি রোধ করার চাইতে অন্যান্য রোগের চিকিৎসা করা কম প্রয়োজনীয় নয়। পঞ্চাশ বছর আগে দেহে অস্ত্রোপচার করা যে সম্ভব সে কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি। আজ কিন্তু তা' সম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। পেটের মধ্যের কম সাংঘাতিক টিউমার আজকাল সহজেই দূর করা যায় এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সাংঘাতিক ধরনের টিউমারগুলোও বরাবরের জন্য সারিয়ে তোলা হচ্ছে। এমনকি মস্তিষ্কের মধ্যেকার টিউমারগুলিও অস্ত্রোপচার ক'রে সারান হচ্ছে। বহুমূত্র রোগও দমন করা সম্ভব হয়েছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হাঁপানীর কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে এবং ঐ রোগ দূর করাও সম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসলে এমন রোগ খুব কমই আছে যা আধুনিক চিকিৎসক সারিয়ে তুলতে না পারছেন। আজকালকার এম ডি উপাধিধারী চিকিৎসকদের দ্বারাই তা' সম্ভব হচ্ছে।

এ কথা খুবই ঠিক যে হাজার হাজার লোক যথাযথভাবে চিকিৎসিত হচ্ছে না। তার কারন এই নয় যে ঐ ধরনের চিকিৎসা লাভ করতে হলে যা খরচ করতে হয় তা তাদের নাগালের বাইরে। তারা হচ্ছে সেই ধরনের লোক যারা ভাবে যে তারা ভালভাবে ভাবতে শিখেছে। নিয়মিত চিকিৎসা করার প্রণালী তারা খুব ভাল চোখে দেখে না। যারা চিকিৎসা লাভ করতে পারে না, বুঝতে হবে তারা চিকিৎসকদের দিয়ে চিকিৎসা করাতেই চায় না। তাদের মূর্খতাই তাদের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় অবশ্য অনেকেই আমার এই উক্তি ভালভাবে নেবেন না। বেশ তাই হোক, সকলেই তাদের দেশের যাতে ভাল হয় তা বলুক। আমি ক্যানসাস সহরের বাসিন্দাদের কথাই বলছি—আমার কাছে হাজার হাজার কেসের নজির আছে যার জোরে আমি আমার উক্তির

সত্যতা প্রমাণ করব। ক্যানসাসের অধিবাসীরা তাদের কাছে কাণাকড়ি থাকুক বা না থাকুক, সব সময়েই ইচ্ছা করলেই চিকিৎসকদের তত্বাবধানে থেকে রোগ সারাতে পারার সুযোগ পায়। এ হচ্ছে সত্য, খাঁটি সত্য এবং নির্জলা সত্য, সন্দেহের কোনও ছায়া পর্য্যন্ত ওতে নেই।

সত্যিকারের চিকিৎসকেরা অবশ্য এই বিষয়ে একই ধরনের মত পোষণ করবেন যে যারা 'কালটিষ্ট'দের দ্বারা বা হাতুড়েদের দ্বারা চিকিৎসিত হয় তাদের যথাযথ চিকিৎসা হয় না। তাদের বেলায় ঐ রকমই হয় কারণ তারা তাই চায়।

এই ধরনের লোকেরা যে ঐ দলের মধ্যে আছে এ কথা মেনে নিলেও বলা চলে যে ওদের সংখ্যা হয়ত জনসাধারণের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী হবে না। জনসাধারণের এক-তৃতীয়াংশ যে যথাযথভাবে চিকিৎসিত হয় না এই উক্তিটি যখন আমরা পর্য্যালোচনা করি তখন তার মধ্যে অনেক ত্রুটীই আমরা দেখতে পাই। যখন তারা ব'লে থাকে জনসাধারণের এক-তৃতীয়াংশ তখন কি তারা বলতে চায় সমস্ত রোগীদের এক-তৃতীয়াংশ? এমন অনেক লোক আছে যারা চিকিৎসিত হতে চায় অথচ তারা পীড়িত নয়, অন্তত শরীরে ত' নয়ই। এই ধরনের লোকেরা চায় অন্যের সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার এবং যদি সহানুভূতি দেখিয়ে তাদের আমোদ-আহ্লাদে ভুলিয়ে রাখা যায় তাহ'লে তাদের বিচারবুদ্ধির বিকাশ হতে পারে। এই শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে দলে যারা বেশী, তাদের শরীরে বা সামাজিক ক্ষেত্রে অসঙ্গতি আছে। এদের দোহাই দিয়ে ভণ্ডরা নানান যুক্তির অবতারণা ক'রে থাকে। এদের চিকিৎসা করার প্রয়োজনও হয় না এবং এরাও চিকিৎসা করাতে চায় না। তবে অকারণ কেন কেউ কেউ তাদের জন্য চোখের জল ফেলবে? তারা খুব সুখেই দিন কাটাচ্ছে এবং যদি বা যখন তারা পীড়িত হয়ে পড়বে তখন তো তারা আপনাদের বন্ধু অধম এই এম-ডি'কে

খুঁজে বার করবেই ! ডাক্তারেরা এখনও এক মহা সঙ্কটের সম্মুখীন—প্রধানতঃ রোগীরাই এর সঙ্গে জড়িত। ঔষধবিজ্ঞান এতদূর উৎকর্ষলাভ করেছে যে তা আমাদের কল্পনার অতীত। যখন ঐ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান রোগীর পরিচর্য্যার কাজে লাগান হয় তখন তা রূপান্তরিত হয় একটি শিল্পকৌশলে। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় শিল্পকৌশলে কোনও ব্যক্তি কতটা ব্যুৎপত্তি লাভ করবে তা নির্ভর করে ঐ বিষয়টি নিয়ে চর্চ্চা যিনি করবেন তাঁর সামর্থ্যের উপর। এখন কর্ত্তব্য হচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা ঐ নিয়ে চর্চ্চা করেন তাঁরা যাতে ঐ বিষয়ে যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ করতে পারেন তার জন্য অনুপ্রেরণা দেওয়া। তবে একথা ঠিক যে ঐ উদ্দেশ্য কিছুতেই সফল হবে না যদি উপযুক্ত ডাক্তার নির্ব্বাচনের ভার দেওয়া হয় কারখানার কোনও মালিক বা রাজনৈতিক দলের নেতার উপর। সব চাইতে উপযুক্ত বাছাই তখনই আশা করা যাবে, রোগীর উপরেই যখন ভার দেওয়া হবে তার চিকিৎসক নির্ব্বাচন করবার। ঔষধবিজ্ঞান হচ্ছে একটি জটিল বিষয় ডাক্তারের সঙ্গে রোগীর সম্বন্ধ হচ্ছে অন্য এক জিনিষ।

আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যে যথাযথভাবে চিকিৎসা করাতে হলে যথেষ্ট খরচ করতে হয়। গরীবরা দাতব্য হাসপাতালে থেকে চিকিৎসা করাতে পারে এবং ধনীদের প্রথম শ্রেণীর হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়ার সামর্থ্য থাকে। প্রথম ব্যবস্থানুযায়ী চিকিৎসালাভ করতে হলে মধ্যবিত্ত-শ্রেণী তাদের গর্ব্ব ক্ষুণ্ণ হল ব'লে মনে ক'রে থাকে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শেষের ধরনে চিকিৎসালাভের মোটা খরচ যোগাড় করতে পারে না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দু'টো বাধা আছে। অনেক লোকই দুঃসময়ের জন্য কোনও ব্যবস্থাই করে রাখে না এবং যখন তারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে তখন তারা সেই সময়ের বাড়তি খরচ বহন করতে পারে না। চেষ্টা চলছে যাতে এই শ্রেণীর লোকেরা জীবন

বীমা ক'রে রাখে যাতে ক'রে এই সব বিপদের সময় তার সাহায্যে বিপন্মুক্ত হতে পারে। এমন লোক অনেক আছে যারা আমার এই ধরনের নিরাপত্তার উপায় গ্রহণের সুযোগ অবহেলা করে নেয় না। এই ধরনের লোকেদের অবৈতনিক প্রতিষ্ঠানগুলির টিঁকে থাকার পথে বাধা স্বরূপ হওয়া উচিৎ নয়। সহরের হাসপাতালের অত্যধিক খরচ একটা প্রধান অন্তরায়। রাজপ্রাসাদগুলো তৈরী হয় কেবলমাত্র ধনীদেরই জন্য—সাধারণ লোকেরা এবং স্থপতিরা তাদের স্বপ্ন-সৌধকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য এক বড় অংশ গ্রহণ করে। আসল এবং সব চাইতে বেশী দোষী হচ্ছে সেই সমস্ত লোক, যারা নির্দ্ধারিত আদর্শের অনুরূপ কাজ করে—ওদের যদিও ভুল করে বলা হয়ে থাকে চিকিৎসক—ওদের কিন্তু হাসপাতালে কি কি জিনিষ দরকার হতে পারে সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই থাকে না। আমার বিশ্বাস সাধারণতঃ যাদের বুদ্ধিমান ব'লে মনে করা হয় তাদের কাছ থেকে প্রথমে হাসপাতালগুলিই বাধা পায়। হাসপাতালের চিকিৎসার খরচ এত বেশী হওয়ার জন্য এই সব লোককেই দোষ দেওয়া উচিত। এদের নিয়ে আমরা কি করব? কিছুই করতে পারব না। তারা কোনও দিনই কিছু শিখবে না, এবং তাদের গুলী ক'রে মারতে চাইলে আইন সম্মতি দেবে না। আমার এই বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য, কেননা আমি এই বিষয়টি নিয়ে বহুবৎসর যাবৎ চিন্তা করেছি।

আমি খুব জোরের সঙ্গেই বলব যে, এই সমস্ত লোক যারা নির্দ্ধারিত আদর্শানুরূপ কাজ করে তারা যে-সমস্ত ক্ষেত্রে মায়াকান্না কাঁদতে পারে কেবলমাত্র সেইখানেই যেন গলাবাজী করে। ক্যানসাসে এ ধরনের কোনও সমস্যাই নেই।

সংক্ষেপে বলা যায়, রোগমুক্তি যা আজ সর্ব্বসাধারণে লাভ করতে পেরেছে তা সম্ভব হয়েছে পেশাদার ডাক্তারদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে। যাদের রোগ খুব মারাত্মক রকমের নয় বা যারা নীরোগ তাদের

বেলায় কিছুই যায় আসে না 'কালটিষ্ট'দের সহচর হয়ে থাকাতে। মূর্খের মত কাজ করতে আপত্তি নেই যদি আমাদের পাশেই এমন একজন কেউ থাকেন যিনি আমাদের মূর্খতার জন্য কুফলের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন। কিন্তু একথার উপর গুরুত্ব দিয়েই বলা যায় যদি 'কালটিষ্ট'রা উত্তরাধিকার সূত্রে এই পৃথিবী লাভ ক'রে থাকেন তা'হলে মড়ক তাদের প্রারম্ভিক প্রাচীন বীভৎসতা নিয়ে আমাদের উপর এসে পড়বে। তখনকার দিনে গ্রামাঞ্চলে ডিপথিরিয়ার মড়কের সময় ভাবাবেগোত্তেজক প্রার্থনা ষাট বছর পরেও আজ আমি শুনতে পাই। এই সবের চাইতে এক টিউব অ্যান্টি-টক্সিন অনেক বেশী উপকার করবে। আমি এই সমস্ত জিনিষের সব কিছুই দেখেছি। একজন এম-ডি ডাক্তার সব সময়েই সত্য চিন্তা করবেন। তিনি যদি সময়ে সময়ে তা' ঘোষণা করেন তা'হলে সম্ভবতঃ আরও ভালই হয়।

সমাপ্ত

BAGHBAZAR READING LIBRARY CALCUTTA
বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা ৫-১১১
পরিগ্রহণ সংখ্যা ১৪,৭৮৮
পরিগ্রহণের তারিখ ৭-১২-৮৮